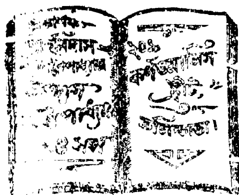
আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তঅষ্টতিতম গ্রন্থ

আহুতি

শ্রীসরসীবালা বসু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রাবণ—১৩২৯



প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

বাঙলা দেশের

নিষ্ঠুর বরপণের নামে—

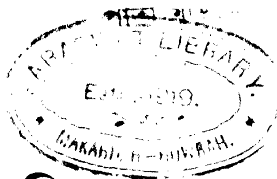
উৎসর্গ ক'র্‌লাম

আমার "আহুতি"কে—

বরের বাপমার রক্ততৃষ্ণা মিট্‌বে কি ?

গিরিডি

বাণীকুটীর



আহুতি

কার্ত্তিক মাস, ভোরের দিকে শীতের বাতাস বহিতেছে, সুতরাং সারা দেহে কাপড় টানিয়া সকলেই উত্তপ্ত শয্যাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে, বসন্তবাবু কিন্তু নিত্যকার অভ্যাস মত এই ভোরে উঠিয়াই মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া তামাক টানিতেছেন, বাহিরে খিড়কীর দরোজা খোলার শব্দ পাইয়া তিনি হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া ডাকিলেন,—"কে, রে, বুড়ি বুঝি?" মৃদু কণ্ঠে উত্তর আসিল "হ্যাঁ বাবা"। বসন্তবাবু আবার হুঁকা দেবীর সাধনায় মন দিলেন, কিছুক্ষণ পরে বুড়ি আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তখন ফর্সা হইয়া আসিয়াছে, সহসা প্রস্ফুট শিউলী ফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিতেই সদ্য-জাগ্রত রেণু চাদরের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া হাঁকিল—

"আমি একটা মালা নেব দিদি।"

ঘন্টি তার উপর এক পর্দা সুর চড়াইয়া কহিল "আমি দুটো মালা নেব বড় দি।"

খোকার ঘুম তখনও ভাঙে নাই, সুতরাং তার আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, বসন্তবাবু কহিলেন "আজ কতগুলো ফুল কুড়ুলি বুড়ি মা?"

বুড়ি কহিল, "এক সাজি বাবা, এ গাছের ফুলগুলো বেশ বড় বড়, আর দেখ, পাতাগুলো কেমন পুরু, তোমার চৌকির ওপর গোটাকতক রেখে দিলাম, আর তোমার দুইকাণেও দুটো পরিয়ে দিই, খুব গন্ধ পাবে তা হ'লে।"

সরোজিনীরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, তিনি চাদর সরাইয়া উঠিয়া বসিয়া প্রথমেই হাই তুলিয়া তুড়ি বাজাইলেন, তারপর দুর্গানাম স্মরণ করিয়া মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—

"দিন দিন তোর আক্কেল হচ্ছে বেশ বুড়ি, এখন না উনি নাইবার ঘরের দিকে যাবেন? কাণে ফুল থাক্‌লে ছোঁয়া পড়বে না? ওঁর তো যে হুঁস,

সেই ফুল কাণে নিয়ে এসেই ঘর ঢুকবেন, আর তোমার ঠাকুর মা চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় ক'রে ছাতে কাক চিলও বস্‌তে দেবেন না।"

বসন্তবাবু কহিলেন "দোহাই তোমার, সকাল বেলা চেঁচিয়ে আগে-ভাগে বাড়ী মাথায় কোরো না, এই আমি ফুল খুলে রাখ্‌ছি, নারায়ণ, নারায়ণ।"

সরোজিনী বুড়িকে কহিলেন, "উনুন ধরিয়েছিস বুড়ি, অমলের আজ স্কুল খুল্‌বে, সকাল সকাল ভাত চাই।"

বুড়ি কহিল, "উনুন ধরিয়ে রান্নাঘর ধুয়ে কল-তলায় বাসন ভিজিয়ে দিয়েছি, এখন ঝি এলেই হয়, তুমি যাও শীগ্‌গির কাপড় কেচে নাও, আঁচ উঠে গেছে।"

সরোজিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমিও তা'হলে সকাল সকাল চাট্টি ভাত মুখে দিয়ে ছেলে দেখে ঐ পথেই আফিস চলে যেয়ো, যদি ওরা হাজার খানেকেই রাজী হয় তা হলে আর কথাবার্ত্তা না, সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক করে

ফেলো, আস্‌চে মাসেই যাতে সুভালা-ভালিতে কাজটি সারা হয়ে যায়, নইলে মেয়ে দেখে তো আর গলা দিয়ে জল পেরুতে চায় না, দিন রাত্তির বুকের ভেতর যেন গুর্‌ গুর্‌ করচে, তার ওপর তোমার মার যা কথা, উনি মনে করেন আমরা বুঝি ইচ্ছে করেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না, মেয়ের তো নামই রেখেছেন থুবড়ি যেন কোনো কালে মেয়ের আর বিয়েই হবে না।”

বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিতেই বুড়ি পলাইয়া গিয়াছিল, বসন্তবাবু অনেকক্ষণ হইতে নিবিষ্ট মনে হুঁকা টানিতেছিলেন ও সেই সঙ্গে মনের মধ্যে পূর্ব্বাপর অনেক কথাই আলোচনা করিতেছিলেন। যদিও সেই আলোচনার মধ্যে আনন্দ ততোটা ছিল না যতটা ছিল অভাব ও দৈন্যের তীব্র অনুভূতি।—স্ত্রীর কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ক্রমেই তাঁহার হুঁকার টানের বেগ কমিয়া আসিতেছিল, কথা শেষ হইবামাত্র ঠক্ করিয়া হুঁকাটি হুঁকাদানের উপর বসাইয়া রাখিয়া রুক্ষকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন,

"তা ব'লে কি তোমরা চাও যে মেয়েটার গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিই ? রাতদিন তোমাদের টিক্‌টিকিনীর জ্বালায় বাড়ীতে তিষ্ঠুনো আমার দায় করে তুল্‌লে দেখ্‌চি।" স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতি স্বামী যে সহসা এতোটা উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন সরোজিনী তাহা মোটেই মনে করেন নাই, সুতরাং সকাল বেলা আর কথা না বাড়াইয়া তিনি আপনার কাজে চলিয়া গেলেন, বুড়ি যেখানে বসিয়া সূচ সূতা লইয়া মালা গাঁথা সুরু করিয়াছিল, সেখান হইতে পিতার তীব্র কণ্ঠের ভাষা স্পষ্টই শুনা গেল, একটু আগে যে তরুণ মুখের দীপ্তি সদ্য আহরিত শিউলী ফুলগুলির মতই সরস মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ দেখাইতেছিল, চকিতে তাহা মিলাইয়া গিয়া বিমর্ষ ভাব সেই ফুল্ল মুখখানিকে মলিন করিয়া তুলিল। সেই সময় ঠাকুর মা নিদ্রা ভঙ্গে তুলসী-মূলে প্রণাম করিয়া চৌকাঠে জল দিতে আসিলেন। নাতিনীকে নতমুখে মালা গাঁথিতে দেখিয়া কহিলেন—"ঐ মালা গাঁথাই তোর সার লো, কার গলায় যে দিবি

তা জানি না, তোর মত অপ্সরীর জন্যে কোন কার্ত্তিক যে ময়ূরে চড়ে আস্‌বেন তা মা কালীই জানেন”।

বুড়ি ম্লানমুখে হাসি টানিয়া কহিল—“তোমারই গলায় দেবো ঠাকুর মা, দিব্যি মানাবে, রঙে রঙে মিলে যাবে।”

ঠাকুর মা কহিলেন “সত্যিই বয়েস কালে এই শুক্নো চামড়ার রঙ ফুলের রঙেরি মতন ছিল গো,—এখনো যা আছে তা যদি তোর চামড়ায় খানিক লাগাতে পারতাম্ তো কাজ হতো, তা তো আর হবার নয়, এখন একটা কাজের কথা বলি শোন্, এবছর বোশেখ মাসে রোগে পড়ে শিবপূজোর তো উদ্‌যাপন করতে পারলি না—তা ঘর বর মিল্‌বে কোথেকে, আর সাতদিন বই সংক্রান্তি আসচে, এই সংক্রান্তি থেকে বারোমেসে শিবপূজোর ব্রত নে দেখি, তবে যদি মহাদেব দয়া ক’রে খুবড়ির প্রতি মুখ তুলে চান্, তোর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে, আর বাপ মার মুখে তোর স্বচ্ছন্দে ভাতের গরাস উঠ্‌চে।”

নিদ্রা ভঙ্গে খোকা কাঁদিয়া উঠিল, বুড়ি মালা গাঁথা ফেলিয়া ভাইকে কোলে লইতে ছুটিল, বসন্ত-বাবু মাথা হেঁট করিয়া মা'য়ের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন, মাতার তীব্র মন্তব্য সুস্পষ্ট ভাবেই তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল।

২

সকাল বেলা স্বামীর কথার ঝাজ শুনিয়া সরোজিনী অফিস যাইবার সময় স্বামীকে আর সেই পথে ছেলে দেখিবার কথা বলিতে পারিলেন না, মনটা বড় অপ্রসন্ন হইয়াই রহিল।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া প্রত্যহ বুড়ির চুল বাঁধিয়া তার মুখে হাতে নিজের হাতেই সরময়দা মাখাইয়া দেন, মেয়ের রঙ ফর্সা নয়, যাহাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সেই রঙ, মুখ চোখের গঠন মন্দ নয়, কিন্তু হইলে কি হয়, একে মৌলিক কায়স্থর মেয়ে, তার উপর পিতার অর্থাভাব, অথচ মেয়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর বর্ণ নয়, এক্ষেত্রে তার

অদৃষ্টে সুপাত্র মেলা আধুনিক বঙ্গ-সমাজ রীতি অনুসারে নিতান্তই অসঙ্গত ব্যাপার।

অগত্যা ঘষা-মাজার দ্বারা যতটা উন্নতি সম্ভব, মা তাহা করিতে পশ্চাৎপদ নন্, পাশ করা ভাল একটি জামাই আনিতে সরোজিনীর বড়ই সখ ছিল, নিজের হাজার টাকার গহনা সংসারের অনেক অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও এতোকাল ধরিয়া তিনি অতি যত্নে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন, ইহার পণে একটী সুপাত্র কিনিবার জন্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া সে বাসনা তাঁহার কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গিয়াছে, যে পাশ করে নাই, তারই হাঁক হাজারের নীচে না, পাশ করার তো কথাই নাই! আজ দুই বৎসর হইতে বর খোঁজার পালা চলিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই ফল হয় নাই, মেয়ে ছোট ছিল বলিয়া এতোদিন বিশেষ চাড়ও ছিল না, এখন সে চৌদ্দ বছরেরটী হইয়াছে, হিন্দুর গৃহে অতোবড় মেয়ে কুমারী রাখা মহা পাপ, অথচ বরও জোটা দায়, স্বামীর ষাটটী টাকা মাত্র আয়ে কলিকাতা সহরে

ছেলে মেয়ে লইয়া সাত আট জনের ভরণ পোষণ ব্যয় নির্ব্বাহ বড় সোজা কথা না। কোনো রকমে সংসার খরচ চলিয়া যাইলেও উদ্বৃত্ত এক পয়সাও হয় না, তার উপর ছেলের পড়ার খরচ আছে। বসন্তবাবু পারৎ পক্ষে একটী পয়সাও ট্রাম ভাড়ায় খরচ করেন না, করিবেনই বা কোথা হইতে? এ অবস্থার লোকের কন্যাদায় কি ভীষণ, তাহা ভুক্ত-ভোগীরাই জানেন। অথচ যে কোনো প্রকারে এ দায় হইতে মুক্ত না হইলেও মুক্তি নাই।

সরোজিনী মেয়ের চুল বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন, "সরময়দা মেখেচিস্?"

বুড়ি, কহিল "না।"

"মাখনি কেন, রোজই বুঝি বুড়ো মেয়েকে আমি মাখিয়ে দেব, তবে হবে?"

মা নিজেই রোজ মাখাইয়া দেন, আজ যে হঠাৎ তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বুড়ি বেচারী তাহা জানিত না, সুতরাং বলিল, "মাখাও কেন, আমি কি মাখাতে বলি?"

"তুমি বল না, তোমার কালরূপ যে বলে, সাধে কি আমার মাথা ব্যথা হয়? যদি ছাই—রঙেরও একটু চেক্‌নাই থাক্‌ত তা বর আর জুটবে কোত্থেকে।"

অপরাধীর মত মুখ নীচু করিয়া বুড়ি বসিয়া রহিল, রেণু ও ঘণ্টি উঠানে বসিয়া খেলা ঘরের ভাত রাঁধিতে ছিল, হাঁকিয়া উঠিল, "অ মা, ঘটকী দিদি এসেচে, ও ঘটকী দিদি, জামাই বাবু কবে আন্‌বে গো!"

ঘটকী কহিল, "এই আন্‌লাম ব'লে, তোর বাপ মা তখন কেমন বক্‌সীস দেয় দেখ্‌বো।"

ঘটকীকে দেখিয়া সরোজিনী মনের বিরক্তি চাপিয়া হাসিমুখে কহিলেন, "এসো মা, মাসখানেক পরে যে বাড়ী মাড়িয়েচ এই ঢের বাছা।" বুড়ি উঠিতে যাইতেছিল, ঘটকী খপ্‌ করিয়া হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "বোস্‌ গো বোন্‌, বোস্‌ একটু, এক মাস আসি নি বটে, এদিকে তো বিয়ের লগনও নেই, সেই জন্যেও,—তা ছাড়া

পূজোয় যে দেশে গেছলাম গো। মেয়ে তোমার এক মাসে আর একটু বেড়েছে, রঙ্গও ফর্সা হয়েচে মনে হচ্ছে, বে' থা হলে, নিজের গায়ের যত্ন নিজে শিখলে এই রঙেরই আবার জেল্লা খুলে যাবে, তা কোথাও পাত্তর-টাত্তর কিছু ঠিক্ হয়েচে না কি ?"

সরোজিনী কহিলেন, "ঠিক্ আর কোথা হবে বাছা, তোমাদের হাতেই কলকাঠি, আমরা তো তোমার মুখ চেয়েই ধন্না দিয়ে ব'সে আছি, দেখে শুনে দাও একটি—আর তো মেয়ে ঘরে রাখা চলে না,—দেখ্‌চ তো কত বড়টি হয়ে দাঁড়াল, বয়স বেশী না হ'লেও লোকে তা মান্‌বে কেন, বল্‌বে, ষোল সতের বছরের।"

"বলুগ্‌ তা, আমার তো দেখ তা বয়েস, মেয়ে ছেলে কলা গাছের বাড়, এখন বাড়বার মুখে বাড়বে না তো কি ঘেঁটুরে পানা হয়ে থাক্‌বে? চোদ্দ বছর আর এমন কি বয়েস, মিত্তিরদের বাড়ী দু দুটো মেয়ে আঠার বছরের ধাড়ী হয়ে রয়েছে, বাড়ীতে মেয়ে মাষ্টার রেখে তারা গান, বাজনা,

কত কি শেখাচ্ছে, দত্তদেরও তাই, যত সম্বন্ধ নিয়ে যাই, পছন্দই হয় না, টাকা নেই তাও নয়, লোকে একথা বল্‌তে পারবে না যে টাকার অভাবে মেয়ে অতো বড় করে রেখেচে।"

সরোজিনী কহিলেন, "বড় লোকদের কথা আলাদা মা, টাকার জোরে তারা লোকের কথা গ্রাহ্যও করবে না, আমাদের যখন সে বল নেই, তখন দশের কথাই আমাদের সব, হিঁদুর ঘরে এতো বড় মেয়ে রাখা মহাপাপ জান ত, সাত বছরে গৌরী দান, বছরে ন' কন্যাদান, সে সব তো চুলোয় গেল, এখন চোদ্দ বছরের মেয়ে গলায় বেধেছে, পার করতে পারলে বাঁচি।"

এইবার বুড়ি উঠিয়া গেল, ঘটকী কহিল, "একটি ভাল সম্বন্ধ এনেছি, ছেলেটি বি, এ পড়ে, এ বছরেই পাশ দেবে, দেখতে শুনতে চমৎকার, বাপের কলকাতায় লোহার কারবার আছে, তিন চারখানা বাড়ী",—বাধা দিয়া সরোজিনী কহিল, "তাদের তো অনেক খাঁই হবে, তেম্‌নি, আমার

সাধ্যি কি সে পাত্তরের নাগাল পাই, বামন হয়ে চাঁদ ধরবার আমার আর সাধ নেই বাছা।”

ঘটকী কহিল, “হাঁপাও কেন, সব কথা বলি শোনো না, মা বলেচে ছেলের সম্বন্ধ করতে, ছেলের মাসতুতো ভাই ঐ এক বাড়ীতেই থাকে, এক সঙ্গে পড়ে, সে আমায় চুপি চুপি বল্‌লে তাকে আর ছেলেকে যেন আগে মেয়ে দেখান হয়।” ওদের পছন্দ হলে কর্ত্তা গিন্নির হাঁক ডাক বড় টিক্‌বে না, একটি ছেলে, ভারী আদরের, তার আব্দার রাখবেই, এই নাও কাগজ, ছেলের নাম লেখা আছে, ঠিকানা আছে, কাল বিকালে পাঁচটের সময় তাদের আমি মেয়ে দেখাতে আন্‌ব, সব ঠিক করে রেখো, এখন উঠি, বামুন বাড়ীর মেয়ে দেখাতে নে যেতে হবে।”

ঘটকী বিদায় হইল, সরোজিনী কাগজ দেখিলেন,—পাত্রের নাম শ্রীসুধাকান্ত মিত্র। পিতার নাম শ্রীরমাকান্ত মিত্র। পিতামহের নাম ৺রাঘব

বিজয় মিত্র। ১০ নং দর্জ্জিপাড়া লেন,—পাত্র বঙ্গবাসী কলেজে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র।

ছেলেটির পরিচয় শুনিয়া সরোজিনীর বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল, যদি সত্যই এটিকে জামাই করিবার সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে কি আনন্দ। কিন্তু দুই বৎসর হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাঁর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সুতরাং দুরাশাকে হৃদয়ে স্থান দিলেন না, তবে নিতান্ত যদি মেয়ের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় সে আলাদা কথা, এই ভাবিয়া কাগজখানি যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিয়া ছেলেদের জল খাবার প্রস্তত কর্‌বার জন্য উনুন ধরাইতে গেলেন।

৩

বসন্ত বাবুর আসিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি সরোজিনী সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না যে তিনি পাত্র দেখিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই দেরী হইল কি না। বসন্ত বাবু মুখ হাত ধুইয়া আহার করিয়া ঘরে গেলেন, বুড়ি বাবাকে

পান দিয়া তামাকের সরঞ্জাম হাতের কাছে আনিয়া দিল, বসন্ত বাবু তামাক টানিতে লাগিলেন। টানিতে টানিতে তাঁর পনের বৎসরের আগেকার কথা মনে পড়িল, তখন তাঁর বয়স একুশ বৎসর মাত্র, এফ, এ পাশ দিয়া বি, এ পড়িতেছেন, মনে কত উৎসাহ, কত আশা, ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি আশার আলোকে তখন কি উজ্জ্বল, কি সুন্দর! দেহের স্বাস্থ্য চমৎকার, প্লে গ্রাউণ্ডে সেজন্য তাঁর কত নাম, হায়, কোথায় গেল যৌবনের সেই স্বর্ণ সুষমা মণ্ডিত দিন, আজ তারা অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র, জীবনে মানুষের কটা আশা, কটা কল্পনাই বা সফল হয়, তাঁরও হয় নাই। পিতা মাতা সাধ করিয়া একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিলেন, সেই বৎসরই পিতার মৃত্যু হইল, বসন্ত বাবুর বি, এ, পড়া ছাড়িতে হইল। দুটি অবিবাহিতা ভগ্নী ছিল, তাহাদের বিবাহ দিতেই পিতার সঞ্চিত যাহা কিছু পুঁজি ছিল, ফুরাইয়া গেল, রহিল শুধু পৈতৃক বসত বাটীখানি। বসন্ত বাবু চাকুরী লইলেন, গৃহে

একে একে পুত্র কন্যার আবির্ভাব হইতে লাগিল। সংসারে যাহা কিছুরই অভাব হউক, স্নেহের দারিদ্র্য হয় না, অতুল স্নেহে তিনি পুত্র কন্যাগুলিকে মানুষ করিতে লাগিলেন, দীনতার মধ্যেও অশান্তি রহিল না, কিন্তু হঠাৎ বিধাতার অভিশাপের ন্যায় কন্যাদায় তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল, সমাজ রক্ত চক্ষু ঘুরাইয়া চাহিল তার দাবী, তার ন্যায্য পাওনা,—পরিশোধ না করিলে উপায় নাই, উপায় নাই, ইহলোকও না, আবার পরলোকেও না। এ দাবী সে সকলেরই নিকট করে, কিন্তু অর্থ হীন, নিঃস্বের নিকট মহাজনের এই ন্যায্য পাওনার দাবীও যে কি ভীষণ, তাহা সেই হতভাগ্যই মর্ম্মে মর্ম্মে জানে, আর জানেন যদি কেহ থাকেন সমাজের অধিষ্ঠতা অন্তর্য্যামী দেবতা। বসন্ত বাবু নিঃশ্বাস ফেলিলেন, সম্মুখেই তাঁহাদের কলেজের ক্লাবের একটি ফটো ছিল, তাহাতে তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য সম্পন্ন তরুণ যৌবনের ফটোখানি এই পনের ষোল বৎসর পরেও

অবিকৃত রহিয়াছে, কিন্তু সত্যকার দেহখানা এখন তার কঙ্কালসার ছায়ায় পরিণত। প্রশান্ত ললাট চিন্তার রেখায় কুঞ্চিত, মুখের হাসি ম্লান, দেহের সে লাবণ্য ঝরিয়া গিয়াছে, সরল দীর্ঘায়তন সুঠাম শরীর কৃশ হইয়া অনেকটা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, হায় রে পরিবর্ত্তন !

খোকাকে ভাত খাওয়াইয়া শোয়াইতে আসিয়া বুড়ি দেখিল, বাবা হুঁকা হাতে স্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন, কলিকার আগুন ফুৎকার অভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ, সে খোকাকে শোয়াইতে শোয়াই-তেই বলিয়া উঠিল, "অঃ বাবা, তোমার কল্কের আগুন নিভে গেল যে, টান্‌চ না কেন ?"

"ওহো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে" বলিয়া বসন্ত বাবু ভুলের ত্রুটি সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলেন, বুড়ি বাবার কাছে আসিয়া কহিল, "তুমি বিছানায় শুয়ে কাৎ হয়ে তামাক খাবে চল, আমি তোমার পা টিপে দিই, তামাক খেয়ে তুমি তোমার সেই সেদিনকার বলা রাজস্থানের গল্প বল্‌বে।"

সরোজিনী আহার সারিয়া ঘরে আসিলেন, মেয়ের কথা তাঁহার কাণে গিয়াছিল, তিনি কহিলেন, "তোর ঠাকুরমা পায়ে তেল দিতে ডাক্‌চে, যা বুড়ি, এখুনি নইলে বকাবকি করবেন।" অগত্যা বুড়ি চলিয়া গেল, সরোজিনী ঘটকীর দেওয়া সেই কাগজখানি স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "সুন্দরী ঘটকী আজ একটা ভাল সম্বন্ধ এনেচে, কাল তারা বেলা তিন চারটের সময় মেয়ে দেখতে আস্‌বে, যদি মেয়ে পছন্দ হয় তো বল্‌চে, টাকা পয়সার জন্যে আট্‌কাবে না।"

বসন্ত বাবু কাগজখানিতে দৃষ্টি বুলাইয়া কহিলেন, "বি, এ, পড়চে ছেলে, বাপের লোহার কারবার, কলকাতায় তিন চারখানা বাড়ী, এই কলিকালে এ সম্বন্ধ ধরতে হলে অনেক হাজার টাকার পুঁজি চাই, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেবার আশা দুরাশা মাত্র।"

সরোজিনীও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, কিন্তু স্নেহান্ধ মন দুরাশার ছলনে লুব্ধ হইতে

ছাড়ে কই? স্ত্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া বসন্ত বাবু কহিলেন, "সেই ছেলেটি দেখ্‌তে গেছলাম গো—"

সরোজিনী সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কেমন ছেলে, বয়স কত হবে?" "বেশী কিছু না, আমার চাইতে যদি বছর দু'তিন বড় হয়, তিনটি ছেলে মেয়ে আছে, রেণু আর খোকার বয়সী দুটি, বড় মেয়ে শ্বশুর বাড়ী আছে, গেল বছর বিয়ে হয়েচে তার।"

সরোজিনী নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ছেলের চেহারা কেমন, থাঁই কত বুঝলে?"

"চেহারা ভালই, ঘরে ভাত আছে, কাজেই আমার মতন বুড়িয়ে যায় নি, মেয়ে পছন্দ হলে টাকার জন্যে বোধ হয় আটকাবে না--"

"তা দেখ, এদিকে যদি না হয়, ঐ ছেলেটির সঙ্গেই তা হ'লে ঠিক করে ফেলতে হবে, মেয়ে তো আর ঘরে রাখা যায় না।" ম্লান মুখে এই কথাগুলি বলিয়া সরোজিনী একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলিলেন, সে নিঃশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারিয়া বসন্ত বাবুর বুকে যেন একটা মোচড় পড়িল।

৪

বেলা দুইটা বাজিতেই সরোজিনী মেয়েকে ঘসিয়া মাজিয়া একটু শ্রী ফুটাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, ঠাকুর মা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "ওলো থুবড়ি যতই ঘসা মাজা কর, ও রঙ সাদা হবার নয়, বরং আমার গায়ে খানিক গা ঘসে দ্যাখ্ যদি একটু চিকণ হতে পারিস্।" সরোজিনী আর সহিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, "তুমি বাপু থুবড়ি নাম দিয়ে মেয়েকে থুবড়িই করে ফেল্‌লে। ওকি অলুক্ষণে নাম গো, সত্যিই কি মেয়ে জন্ম ওর থুবড়ি হয়েই কাট্‌বে?"

ঠাকুরমা আর সে কথার উত্তর না দিয়া নাতিনীকে কহিলেন, "গা হাত ধুয়ে একবার এদিকে আসিস্ লো—"

বুড়ি গা হাত ধুইয়া ভিজা কাপড়ে ঠাকুরমার ঘরে ঢুকিতেই ঠাকুরমা দুটি উপুড় করা বাটী নাতিনীকে দেখাইয়া একটি তুলিতে বলিলেন, বুড়ি

মধ্যে মধ্যে এ প্রকার বাটী ঢাকা তুলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, সুতরাং কম্পিত বক্ষে একটি তুলিয়া ফেলিল, সেটির মধ্যে একটি ফুটন্ত গোলাপ ছিল, ঠাকুরমা খুসি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কপাল বুঝি ফিরেচে লো, বিয়ের ফুল এদ্দিনে ফুটল তা হ'লে, তাই ফুটুক যুগল মিলন দেখে বাঁচি। যা এখন, সাজ গোজ করগে যা, দেখা দিতে যাবার সময় ঠাকুর পেন্নাম করে যাস্, বুড়ি মার কাছে চলিল, রেণুই ফুল ও কুঁড়ি ঠাকুরমার আদেশে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, সে লাফাইতে লাফাইতে মার কাছে ছুটিল, "ও মা, দিদির বিয়ের ফুল ফুটেচে, ঠাকুরমা এখুনি দেখ্‌লে।" বলিয়া কলরব করিতে লাগিল, মা শুনিয়া খুসী হইলেন, মুখে বলিলেন, "অতো চেঁচাস্ নি বাছা,. চুপ্ কর।"

একটু পরেই সুন্দরী হেলিতে দুলিতে আসিয়া দেখা দিয়া কহিল, "কই গো, সব ঠিক হয়েচে তো, ছেলেরা বস্‌বে না বেশীক্ষণ।"

বাড়ীতে বাবা থাকিবেন না, সেজন্য মুরুব্বির

পদ দখল করিবার নিমিত্ত অমল স্কুল হইতে ছুটি লইয়া আসিয়াছিল, সে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আসিয়া কহিল, "শীগ্‌গীর কর মা, ওঁরা বেশীক্ষণ বসতে পারবেন না, শুনো মা, ওঁরা আমার চেনা ছেলে, আমাকেও দেখে চিন্‌তে পেরেচেন, বঙ্গবাসী স্কুলে আমিও তো পড়ি, ওঁরা পড়েন কলেজে—"

সরোজিনী মেয়েকে সাজাইয়া ঠাকুরমার ঘরে পাঠাইলেন, ঠাকুরমা অন্নপূর্ণার সামনে নাতিনীকে প্রণাম করাইয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এ সম্বন্ধতেই যেন বিবাহ হইয়া যায়, অতঃপর কম্পিত চরণে বুড়ি ঘটকী ও অমলের সহিত অগ্রসর হইয়া যুবক দুটির সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল, আড়াল হইতে ঠাকুরমা ও মা পাত্রকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বেশ খুসী হইলেন, ছেলেটি সুন্দর বটে, বিদ্যা, ধন সবেতেই যোগ্য পাত্র, এখন মেয়ে পছন্দ হইলেই হয়। বুড়ির নাম ও বিদ্যা শিক্ষা, শিল্প শিক্ষার অল্প বিস্তর পরিচয় লইয়া ছেলে দুটি উঠিয়া পড়িল। ঠাকুরমা অমলকে দিয়া একটু

মিষ্ট মুখ করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, ছেলেরা বিনয়ের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিল, সুন্দরী ঘটকী যাইবার সময় একগাল হাসিয়া সরোজিনীকে বলিয়া গেল, "মেয়ে পছন্দ হয়েচে গো—এখন আট ঘাট বেঁধে কাজ করতে পারলেই এই অগ্রাণ মাসেই লেগে যাবে।" কথাটা শুনিবা মাত্রই সরোজিনীর বুকের রক্ত দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল, মা কালী কি সত্যই তবে এতদিন পরে মুখ তুলিয়া চাহিলেন? তিনি ঘটকীর সহিত খিড়কীর দরোজা পর্য্যন্ত আসিয়া অনুনয়ের সহিত বলিয়া দিলেন, "দেখো বাছা, মেয়ের কপাল আর তোমার হাত যশ, যদি এ ছেলেটিকে জামাই করে দিতে পার, তোমার মনের মতন বকসিস্ পাবেই।"

"আমায় আর বলতে হবেনা মা, আমার সাধ্যি যা তা করবই" বলিয়া সুন্দরী বিদায় হইল, সরোজিনী কাজ কর্ম্মের মধ্যে মগ্ন থাকিয়াও স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এমন

ভাল ছেলে, এক কথায় মেয়ে পছন্দ করিয়া গেল, এ সুখবরটি কতক্ষণে তাঁহাকে শুনাইবেন। যথা সময় বসন্ত বাবু বাড়ী আসিলেন, মুখ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে বসিয়াছেন, সরোজিনী আসিয়া বলিলেন, ছেলে "আর তার ভাই এসে মেয়ে দেখে গেল গো।"

বসন্ত বাবু উত্তর দিলেন না, সরোজিনী আবার বলিলেন, "মেয়ে খুব পছন্দ হয়েচে, ঘটকী বলে গেল, এখন আট ঘাট বেঁধে কাজ করতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, টাকা কড়ির জন্যে আটকাবে না।" বসন্ত বাবু হুকায় দু চার টান জোরে জোরে দিয়া তারপর ধূম উদ্গীরণ করিয়া কহিলেন, "সে 'আট ঘাটটা কি জিনিষ তা জেনেচ কি?"

সরোজিনী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, সত্যই তো এখানে তাঁহার হার হইল, ঘটকীকে এ সম্বন্ধে তো তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই, যাহা হউক, তিনি উত্তর দিলেন, "সুন্দরী আবার আসবে বলে গেচে, এলেই সব বলবে।"

বসন্ত বাবু কহিলেন, "ও সব বাজে কথা, এ সম্বন্ধের আশা তুমি ছেড়ে দাও, এ হবার নয়, সেই দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেটি আজ আমার অফিসে এসেছিল, বুড়িকে একবার দেখতে চায়।"

সরোজিনী অবাক্ হইয়া কহিলেন—"বর নিজে এসে তোমার কাছে মেয়ে দেখবার কথা বল্‌লে, সে কি বেহায়া গো—"

"বেহায়া আর কি, সে তো ছেলে মানুষ না, আমার চাইতে বড় তো ছোট না, ঘরে কেউ গিন্নী-বান্নী নেই, তাতেই বিয়ের তাড়া খুব।"

"ছি ছি, পুরুষগুলোর একটু লজ্জা সরমও নেই, মায়া দয়াও নেই, বুড়ীর বয়সী মেয়ে আছে বল্‌চ, আরও দু তিনটি আছে, তবু বিয়ে কর্ত্তে তর সইচে না, আমি ম'লে তুমিও বোধ হয় অম্‌নি ক'রে এখুনি বিয়ে কর্ত্তে ছোট।"

"ছুটি বোধ হয়, তোমাদের প্রথা থাক্‌লে তোমরাও যে ছুট্‌তে না, তাই বা কে জান্‌চে।"

"দুর্গা, দুর্গা, কাকে কি কথা বল তার ঠিক

নেই, একটু মাথার ঠিক রেখে তো বল্‌তে হয়, অই দেখ, রেণুর সঙ্গে ঘণ্টির লড়াই বেধেছে, হতভাগাদের সকাল সন্ধ্যে রাত দিনই ঝুটোপুটি লেগে আছে" বলিয়া সরোজিনী বিবাদ ভঞ্জন করিতে ছুটিলেন।

৫

নিখিলেশ বসন্ত বাবুর সহপাঠী, পনর বৎসর উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, কেহ কাহার কোনো খবরও জানিতেন না, কলেজে পড়িবার সময় যাহারা এক কালে অন্তরঙ্গ প্রিয় সুহৃদ্‌ থাকে, সংসারের পথে যাত্রী হইয়া শত শত যাত্রীর হুড়াহুড়িতে সে সকল অন্তরঙ্গদের অস্তিত্ব কোথায় লুকাইয়া যায়, কে তার উদ্দেশ রাখে? হঠাৎ আজ নূতন বাজারে নিখিলেশের সহিত বসন্ত বাবুর সাক্ষাৎ, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বন্ধুকে পাকড়াইয়া বাড়ী লইয়া আসিয়াছিল, সেদিন রবিবার, সুতরাং সারাদিন দুই বন্ধুতে একসঙ্গে কাটিবে ভাল।

নিখিলেশ তামাক খান না, সুতরাং বসন্ত বাবু একাই হুঁকাদেবীর সাধনায় নিমগ্ন, নিখিলেশ বলিতেছেন, "তোমার গায়ে হাত দিতেই তুমি আমার দিকে এমন ভাবে চাইলে, যেন সে মুখ, অপরাধীর মুখ, আমি শুদ্ধ সে চাউনি দেখে চমকে উঠেছিলাম।"

বসন্ত বাবু কহিলেন, "হঠাৎ যে ভাবে তুমি গায়ে হাত দিয়েছিলে, তাতে আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল, কেন না তুমি ঠিক্ হাত তো দাও নি, হাতখানা পাকড়াও করে ধরেছিলে; তোমার লোহার মতন শক্ত হাত দিয়ে—আমি গরীব মানুষ, দিন আনি, দিন খাই গোচ ব্যাপার, কিন্তু বাজারে কারু কাছে ঋণী নই, সুতরাং পাওনাদার এসে যে টুঁটি টিপে ধরতে পারে, সে ভয় ছিল না। এক ধারি সমাজের, অর্থাৎ মেয়ের বিয়ে দিয়ে উঠতে পারচি না, মেয়ে মস্ত হয়ে উঠেছে, আর তার চাইতে ভাবনা বেশী হয়েচে আমার চাইতে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সমাজের—তা সে সমাজ যে হঠাৎ

বাজারের মাঝখানে মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দিয়ে মেয়ের বিয়ে না দেওয়ার কৈফিয়ৎ চাইবে তাও তো মনে হয় না, এই সব পাঁচরকম ভেবেই হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলাম।”

নিখিলেশ হাসিয়া কহিলেন, “ঐ এক সেকেণ্ডের মধ্যে এতো সব ভাবলে কখন হে!”

“আলোর গতি এক সেকেণ্ডে কত মাইল চলে জানা আছে তো, চিন্তার গতি তার চাইতে কোনো অংশেই কম না—”

“মেয়ের বিয়ের ভাবনাতেই তুমি পাগল হ’য়ে উঠেচ দেখ্‌চি, তোমায় দেখে যে বলবে তুমি সেই—আগেকার বসন্ত, এই বয়সেই পঞ্চাশ বছরের বুড়ো হ’য়ে দাঁড়িয়েছ দেখে হাসিও পাচ্ছে, কান্নাও পাচ্ছে।”

“তোমার চেহারা বেশ ভালই আছে, সত্যিই কি তুমি বিয়ে থা করনি? আমার তো ভাই বিশ্বাস হয় না।”

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নিখিলেশ

কহিলেন, "কেন বিশ্বাস হয় না? বাঙ্গালী হ'য়ে এতো বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না করাটা অসম্ভব বলেই বুঝি বিশ্বাস হয় না? তা—যা—বলেচ ভাই, আমাদের দেশে যথাসময়ে বিয়েটা চাই-ই—তা— তার অবস্থা যেমনি হোক্, সে রোগীই হোক্, পঙ্গুই হোক্, উপার্জ্জনহীনই হোক্, বিয়ে তাকে করতেই হবে। অনেক জায়গায় পরিচয় হবার পর লোকে যখন আমার পরিবারবর্গের সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করে, আমি উত্তর দিই "আমি এখনো অবিবাহিত।" তা তাঁরা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে যান্, আমি কিন্তু যতই বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর্‌চি, ততই আশ্চর্য্য হচ্ছি, বিবাহ বলে এতো বড় দায়িত্বটা কাঁধে নেবার সময়, এদেশের লোক অগ্র পশ্চাৎ এতোটুকু চিন্তা করে না কি বলে।" "নিজে কুমার আছ ব'লে ওই সব—বল্‌চ, হিন্দুর ছেলে হ'য়ে বিয়ে যে একটা মস্ত বড় সংস্কার এটা মান তো? সমাজ ধর্ম্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-পালন ক'রতে হ'লে বিবাহ তো—অত্যাবশ্যক, তা ছাড়া সময়ে

বিবাহ না হ'লে নর নারীর প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল হ'তে পারে, এসব অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করেই শাস্ত্রকারেরা যথাসময় বিবাহের উপদেশ বিধি দিয়ে গেছেন।"

"মাপ কর ভাই, তোমার সব কথা মান্‌তে পার্‌চি না, সমাজ ধর্ম্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-পালন কর্‌তে হ'বে ব'লে যে, ভবিষ্যতের উপার্জ্জনের পথ বেছে না নিয়ে, হুট করে বিয়ে ক'রে বসা,—এ তো আমি কিছুতেই মান্‌তে পারি না, উচ্ছৃঙ্খল হ'বার কথা বল্‌চ, যাদের প্রকৃতিতে উচ্ছৃঙ্খল হ'বার বীজ আছে, তারা সাতটা বিয়ে করেও উচ্ছৃঙ্খল হবে বলেই আমার বিশ্বাস। সেই সঙ্গে দেশের শিক্ষা দীক্ষা, চিন্তাশূন্যতাও অনেকটা দায়ী, যে দেশের মধ্যে হাজার দিকে হাজার সমস্যা জেগে উঠেচে, যে দেশের লোক দিন দিন অন্ন বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতার জন্য পাগল হ'য়ে শুধু হা অন্ন, হা অন্ন করে চীৎকার করচে, তাদের দেশের লোক বিয়ে না দিলেই উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে। দামোদর আর

অজয় নদের বন্যা যেন তাদের গ্রাস করে তার খিদে মেটায়, এই আমার প্রার্থনা।”

“আস্তে হে আস্তে, গিন্নী হয়তো ভাববেন তোমার ছিট্ টিট্ কিছু আছে। আচ্ছা, মেনে নিচ্ছি, তুমি বিয়েই করনি, কেন করনি, তা জিজ্ঞেস কর্ত্তে পারি কি।”

“খুব পার, বাবা মারা যাবার সময় দেনা রেখে গেলেন হাজার তিন টাকা ; সৎমা আর তাঁর দুটি আইবুড়ো মেয়েকে আমার ঘাড়ে দিয়ে গেলেন। সে বছরই সবে বি, এ পাশ করেছি, থাকবার মধ্যে ছিল দেশের সেই ভাঙা বাড়ী আর কিছু ধানজমী, আর একটা পুকুর।

“মহা বিপদে পড়্লাম, সঙ্গে সঙ্গেই চাকরী চাই, কিন্তু পাই কোথা ? একে তাকে মুরুব্বি ধরে অতি কষ্টে ত্রিশ টাকা মাইনের এক চাকরী জোগাড় করলাম, কিন্তু তাতে কষ্টে সৃষ্টে পরিবার প্রতিপালন হ’লেও ঋণ শোধের কোনো উপায় হয় না, বোনেদেরও বিয়ে হয় না,—সুতরাং মহা

বিপদ। মা একটু বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি বল্লেন, কোনো স্কুলে মাষ্টারী নিয়ে এম,এ, পড় আর বে-থা কর, আমি সম্বন্ধ দেখি। বি, এ, পাশ ছেলে, ভিটে মাটী আছে, এম, এ, পড়চে, কালেক্কে উকীল, মোন্‌সব যা হয় একটা কিছু হবেই ; চার পাঁচ হাজার টাকা কোন্ না লোকে সেধে দেবে। আমার এক ভগ্নীপতি এই অবস্থায় ঠিক্ এম্‌নি ক'রেই মানুষ হয়েছিল ; এখন সে মস্ত উকীল, গাড়ী ঘোড়া, মস্ত বাড়ী, বউকে কত হাজার টাকার গয়না দিয়েছে ইত্যাদি। কাণ পেতে সব শুন্‌লাম, কিন্তু এ পরামর্শ নিতে পারলাম না, নিজেই খেতে পাচ্ছি না, তার ওপর বিয়ে,—মা অনেক বোঝালেন, শ্বশুর মুরুব্বি হ'লে কত সুবিধে হ'বে বল্লেন, কিন্তু আমার পোড়া মন কিছুতেই বাগ্ মান্‌ল না, অনেক ভেবে চিন্তে কাজ কর্ম্মের অবসরে বাজারে বেড়াতে সুরু করলাম। দেখলাম, দালালি ব্যবসাটা মন্দ নয়, পয়সাও আছে, শেষে দেখ্‌লাম, এখানেও মিথ্যে

কথার দাম বেশী, কাজেই পোষাল না, তারপর এক মাড়োয়ারী আড়তদারের দোকানে কাজ নিলাম, এতে ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক বুদ্ধি খুলে গেল, সৎপথে থেকে দুপয়সা উপার্জ্জনও হ'তে লাগ্‌ল, দেনা শোধ করে একটি বোনের বিয়ে দিলাম, মা ধরে বস্‌লেন, এইবার নিজের আর ছোট বোনের বিয়ে এক সঙ্গে জোগাড় কর, আমি বল্‌লাম, দিন কতক সবুর কর, বৌ'য়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার আঁচল ধরে পাছে পাছে যে সব দুর্ভিক্ষের পঙ্গপালদের আবির্ভাব হবে, তাদের খোরাক আগে জুটিয়ে নিই—এ শুনে মা রেগেই অস্থির, তা রাগুন আর যাই করুন, আমি টল্‌লাম না, ছোট বোনটিরও বিয়ে দিলাম, এদিকে বড় বোনটি বিয়ের দু'বছরেই বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে এলেন, এই সব পাঁচ ঝঞ্ঝাটে এখনও আমি আইবুড়ো থেকে গেছি, ওদিকে পশ্চিমের তিন চারটি গ্রাম থেকে সরষে, সরগুজা, তিসি এসবের আমদানী করবার জন্যে আমার যাওয়া দরকার

হয়েচে, এ কাজের জন্যে আমায় সময় সময় নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়, স্থির হ'য়ে বসে বিয়ের চিন্তে করবার অবসর কাজেই খুব কম।"

বসন্তবাবু দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বোনটির বয়স কত হবে, কদ্দিন হলো বেচারী বিধবা হয়েচে ?"

"চার বছর হ'লো আর কি ; চোদ্দ বছরে বিধবা হয়েচে, এখন বছর আঠার বয়স হবে।"

"কোথা আছে সব ?" খালপারে বাসা আছে আমার, সেইখানেই থাকে, মধ্যে মধ্যে মার সঙ্গে দেশে যায়, বোন্‌টি ভারী বুদ্ধিমতী, আর খুব সুশ্রী, মাকে বল্লাম, একবার বিয়ে দেবার জন্যে তো পাগল হ'য়ে উঠেছিলে, বলতো আর একবার চেষ্টা-বেষ্টা করি।" মা শুনেই কাণে হাত দিলেন, বল্লেন "ওসব পাপ কথা মুখে আনিস্ না।" বল্লাম, "হাঁ মা, বিদ্যাসাগর মশায় কি পাপী ছিলেন, তাই বালবিধবার বিয়ের ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন।" মা বল্লেন, "তাঁর কথা পণ্ডিতেই বোঝেন,

আমাদের ওসব কথা ভাবতেও মহাপাপ।" বল্লাম, "না হয়, স্কুলে দিয়ে একটু ভাল করে লেখা পড়াই শেখাই।" মা তাতেও নারাজ। বলেন, "মতি বিগ্‌ড়ে যাবে।" অগত্যা খায় দায়, দুপুর—বেলা প'ড়ে ঘুমোয়, আমি থাক্‌লে এইটু বই টই পড়ে শোনাই, মা আবার তাতে বিরক্ত হন্। এই আমার দীর্ঘ জীবনের সংসার কাহিনী।"

রেণু আসিয়া বলিল, "বাবা, মা বল্লেন, রান্না হ'য়েচে, স্নান করতে যাও, কাকাবাবু সকালে এসে কিছু খেলেন না, স্নান ক'রে ভাত খান্, দুপুর বেলা আবার দিদিকে দেখ্‌তে আস্‌বে।"

"আচ্ছা যাচ্ছি, তেল নিয়ে এস" বলিয়া বসন্তবাবু হুঁকা রাখিয়া দিলেন। রেণু তেল আনিতেই নিখিলেশ তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "কি নাম তোমার গো।"

"রেণু।"

"কি পড়?"

"দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত।"

"বেশ, বেশ, খেয়ে উঠে তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে ভাব করব, দিদি কোথা, তাকে তো একবারও দেখলাম না।"

"দিদির যে বিয়ে হ'বে!"

"কে বল্লে?"

"কেন, আমি জানি না বুঝি?"

"তা জানতে পার, কিন্তু বিয়ে হবে ব'লে কি কাকার সাম্নে বেরুতে নেই পাগ্‌লী!"

বসন্তবাবু ,তেল লইয়া চটাপট্‌ শব্দে পিঠে মাখিতে সুরু করিয়া কহিলেন, "মাখ হে, বেলা ঢের হ'য়েচে, গল্পে গল্পে টের পাইনি!"

৬

আহারান্তে ঠাকুরমা বাতক্লিষ্ট পা দুখানিতে তাপিণ তৈল লাগাইয়া রৌদ্রে প্রসারিত করিয়া, ছায়ার দিকে দেহ রাখিয়া দিবা নিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন, ঘন্টি আসিয়া দুই হাতে ঠাকুরমার সুখসুপ্ত

দেহ খানিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া ডাকিল, "অঃ ঠাকুরমা, ওঠো শীগ্‌গির, দিদির বর এসেচে।

দু তিনবার ডাকিতেই—ঠাকুরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দেশ শুদ্ধো লোক তোর দিদির বর, দিদির বর এসেচে তা আমার কি ?"

ঘন্টি সব প্রথম ঠাকুরমাকে এ সুখবরটি শুনাইয়া অন্ততঃ কিছু বাহাদুরী লাভের দাবী রাখিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরমার অপ্রসন্ন উত্তরে তাহার উৎসাহ দমিয়া গেল। ঠাকুরমা উঠিয়া বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "আবার কে বর এলো আজ, ঐ তোর বাপ যে দোজপক্ষের ছেলের কথা বলছিল সেই বুঝি ?"

ঘন্টি প্রশ্ন শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "হ্যাঁ, তুমি দেখ্‌তে যাবে ঠাকুরমা তো চল না, ইয়া গোঁপ, ইয়া দাড়ী, ইয়া ভুঁড়ী।" ঘন্টির বলিবার ভঙ্গীতে ঠাকুরমা হাসিয়া ফেলিলেন, কষ্টের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "চল্ চল্ তোর ইয়া গোঁপ, ইয়া দাড়ী, ইয়া ভুঁড়ি দেখে আসি, যে

তোর দিদির কপাল, কোনো ভূড়ি দাড়ীওলা বাদসা টাদ্‌সা এসে জুট্‌ল না তো।"

সরোজিনী তখন কন্যা সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন, বর একটি ঘটক সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন, অন্য কেহ সঙ্গী ছিল না, বসন্তবাবু ও নিখিলেশ কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, ভদ্রলোকের সম্মানের জন্য তামাকও দেওয়া হইয়াছিল, ঘটক তার সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, ভাবী শ্বশুরের অপেক্ষা বয়সে বড় হইলেও সম্মানরক্ষার জন্য তামাকটা আর বর ব্যবহার করেন নাই। ঠাকুরমা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া পাত্রটিকে নিরীখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন,বুড়িকে উহাদের সম্মুখে পাঠাইয়া সরোজিনীও শ্বাশুড়ীর সঙ্গিনী হইলেন। ইতি পূর্ব্বে তরুণ পাত্র সুধাকান্তকে দেখিয়া তাঁর চিত্ত ভরিয়া ছিল, সুতরাং এই প্রৌঢ়কে দেখিয়াই তিনি নাক সিঁটকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনেশে চেহারা, ঐ কচি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়; ঐ মিন্সে, সাধ তো মন্দ না।"

ঠাকুরমার চোখে কিন্তু সেই দিনকার ফিট্‌ফাট ছিপ্ ছিপে ছোকরা পাত্রর অপেক্ষা আজিকার প্রৌঢ় বরের গম্ভীর মূর্ত্তিই ভাল লাগিল, তিনি বলিলেন, "মন্দই বা কি, বেশ সুন্দর বউ, তোমার মেয়ের তো বাছা ওর কড়ে আঙুলের যুগ্যি বউ দেখি না, গোল মুখে চাঁপ দাড়ী বেশ মানিয়েছে, মেয়ের বাড় কলাগাছের বাড়, বিয়ের জল পেয়ে ঐ বুড়ী দু দিনেই ধাই পেয়ে মাগী হয়ে উঠ্‌বে, দোজপক্ষের সোয়ামীর হাতে আদর যত্নও পাবে ভাল, টাকাও কিছু বেশী লাগ্‌বে না, বুড়িকে এখন পছন্দ করলে হয়।"

"করলেই বা ঐ বুড়োকে কচিমেয়ে দিচ্ছে কে" বলিয়া সরোজিনী বিরক্তিভরে অন্য কাজে চলিয়া গেলেন, দাঁড়াইয়া বরের রূপ দেখিতে কি শ্বাশুড়ীর কথা শুনিতে মোটেই তাঁহার উৎসাহ রহিল না। বুড়িকে দেখিয়া, দু পাঁচটা এদিক ওদিক কথা-বার্ত্তার মধ্যে গোটা দুই পান চিবাইয়া, নমস্কারান্তে ঘটক সহিত পাত্র বিদায় হইলেন। বুড়ি উঠিয়া

আসতেই নিখিলেশ বন্ধুকে কহিলেন, "মেয়ে তো পছন্দ ক'রে গেল, পয়সা কড়ির কথা তুলতেই তো সৌজন্য দেখিয়ে বল্লে, "ওসবের জন্য আটকাবে না।" কিন্তু আসল কথাও কি তাই?"

বসন্ত বাবু কহিলেন—"তাইই বটে, ঘটকও আমায় প্রথম ও কথা বলেছিল, অর্থাৎ বয়সও কিছু বেশী হয়েছে, ছেলে পিলে তিন চারটি আছে, সহজে কেউ মেয়ে দিতে রাজীও তো হয় না, তাতেই বোধ হয় পাওনা সম্বন্ধে আর দর কস্‌তে ইচ্ছে নেই, তবে কথা বার্ত্তার ভাবে সেদিন বুঝে-ছিলাম, বিয়েটা তাড়াতাড়ি কিছু সারতে চায়, বাড়ীতে কেউ স্ত্রীলোক অভিভাবক নেই ব'লে কিছু বিব্রত হ'য়ে পড়েচে।"

"তাই ব'লে মেয়ের বয়সী এই কচি মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ে এক মুহূর্ত্তে সংসারের ভার, ছেলেমেয়ের ভার, আর নিজের বোঝা সব চাপাতে হবে; তার বইবার ক্ষমতা কতটুকু তা সেও বুঝবে

না, আর তুমি যে মেয়ের বাপ, তুমিও বুঝবে না। বলি, তোমার কি মত ?"

"আমার আর মত কি, মত না থাক্‌লেও অর্থাভাবে মত দিতেই হবে, হুবছর ধরে খোঁজাখুঁজি ক'রে সুপাত্র তো আর জোগাড় করে উঠ্‌তে পারলাম না, বিনি পয়সায় বরের বাজারে বর কিন্‌তে বেরিয়ে ক্রমাগত বরের বাপের নানাধাক্কা খেয়ে খেয়ে প্রাণান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, এখন মিনি পয়সায় অর্থাৎ কম পয়সায় যা পাই তাই ভাল, ছেলেটি নেহাৎ অপাত্রও তো না, বয়স বেশী হয়েছে এই যা, তা ও শরীরের অবস্থা বেশ ভালই।"

"একশ' টাকা তো মাহিনা পান্‌,—নিজের একখানি বাড়ী আছে বটে, সে পক্ষের তিন চারটি সন্তান আছে বল্‌চ, এ পক্ষেও কোন্‌ না চার পাঁচটি সংখ্যা বাড়বে, এতোগুলির ব্যয় নির্ব্বাহ ব্যাপার ভবিষ্যতে যে কিরূপ দাড়াবে তা কি একবার উনি চিন্তা করেছেন ?

"সাধে কি বলি, দেশে বিয়ে জিনিষটা সকল

অবস্থায়, সকল সময় চাই-ই চাই, লোকে মূলো, বেগুন কেনবার সময়ও একটু ভাবে; কিন্তু এই যে কাজটা—এটা করবার সময় ভাব্‌বার চেস্তাবার আর অবসর থাকে না।"

বসন্তবাবু কহিলেন, "নিজে আজ পর্য্যন্ত কুমার হ'য়ে বসে আছ বলে তো সবাই তোমার পথ অবলম্বন করতে পারে না,—আমার মত কন্যাদায়-গ্রস্তরাই বা তা হ'লে দাঁড়ায় কোথা?"

নিখিলেশ রাগিয়া কহিলেন, "তাই তোমার মত কন্যাদায়গ্রস্তদের উদ্ধার করবার জন্যে পঞ্চাশ ষাট যতই বয়স হোক্ না কেন, ঘর তার ছেলে মেয়েতে ভর্ত্তিই থাক্ না কেন, তবু তারে বিয়ের বর সেজে ছাল্‌নাতলায় এসে দাঁড়াতেই হবে। মেয়ের বয়সী, নাত্‌নীর বয়সী, একটা ছোট, মেয়েকে গলায় ঝুলিয়ে বিয়ের সাধ মেটাতেই হবে, এই বা তোমার কোন্ যুক্তি।"

বসন্তবাবু নম্রস্বরে কহিলেন, "আমার যুক্তি যদি অযুক্তিই হয়, তুমি কি যুক্তি দিতে চাও শুনি,

চোদ্দ বছরের মেয়ে আইবুড়ো রেখে দিয়ে, ভাবনায় পেটের ভাত চাল করে কি অজীর্ণরোগে মরতে উপদেশ দাও? উপস্থিত শরীরের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আর একটি মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাববার সময়—তাই যে কপাল গতিকে দাঁড়াবেই, সে বিষয়ে বড় সন্দেহও নেই।”

সহজভাবে নিখিলেশ কহিলেন, “অতো ভাবনাই বা কিসের, পাত্র না জোটাতে পার, দাও মেয়েকে আইবুড়ো রেখে।”

হাসিয়া বসন্তবাবু কহিলেন, “হিন্দু হয়ে হিন্দুকে বেশ পরামর্শ দিতে এসেছ, বেশী কথা বল্‌তে চাই না, নিজের বোন দুটির বেলায় কই এ উপদেশ কাজে ফলাতে পার নি, তা হ’লে বরং কৃতিত্ব বুঝতাম। সেই তো বার তেরো বছরে বোনের বিয়ে দিয়ে চোদ্দ বছরে বেচারীকে বিধবা হতেও দিয়েচ।”

“বল্‌তে পার বটে, কিন্তু এর মধ্যেও কথা

আছে হে, আমার যে তারা বৈমাত্র বোন্, সে কথাটি তো ভুল্‌লে চল্‌বে না, একে তো বিমাতার প্রতি যতই ভাল ব্যবহার কর, এতোটুকু ফাঁক পেলেই তিনি ভাববেন, "পেটের ছেলে হ'লে এ ক্রটি থাক্‌ত না।' লোকে তো সুর আর একটু উঁচুপর্দ্দায় চড়িয়েই বল্‌বে। এম্‌নিতেই যদি এসম্বন্ধ ও সম্বন্ধ ঘোরাঘুরি কর্ত্তাম, মা নাকি-সুরে বল্‌তেন্, "ওদের কপালে যদি সময়ে বিয়েই জুটবে তো সাত তাড়াতাড়ি বাবাকে খেয়ে বস্‌বে কেন।" এই তো গেল প্রথম কথা,—দ্বিতীয় কথা, টাকারও জোগাড় হয়ে গেল, সুপাত্রও জুট্‌ল, সুতরাং বিয়ে দিয়ে ফেল্‌লাম। তোমার যদি ঠিক্ এই অবস্থা হোতো, তোমায় আমি কখনই মেয়েকে আইবুড়ো রাখতে বল্‌তাম না। তা যখন নয়, তখন চোদ্দবছর বয়স হয়েচে বলে মেয়েকে ঘাড় ধরে যে কোনো পাত্র অপাত্রের ঘাড়ে যে চাপাতেই হবে, এ আমি সুবুদ্ধির কাজ বলে মনে করি না।"

"মেয়ের বাবা হওনি ভাই, হলে বুঝতে এ

দায় কি—দায়। আমি বাপ, তাই স্নেহের বশে মেয়ে না হয় ঘরে রাখলাম, সমাজ তা মানবে কেন, শাস্ত্রের শাসন তবে মানতেই হয়, সেই শাসনের দোহাই দিয়েও অন্ততঃ সে আমায় জুলুম করতেই বাধ্য।"

"রাখ ভাই তোমার শাস্ত্র, শাস্ত্রের কটা বিধি যে আজ কাল মেনে চলো তা তো জানি না, তা ছাড়া, শাস্ত্র কি শুধু এই কথাই বলেছে, বার বছরে মেয়ের বিয়ে না দিলেই সমাজ তোমার টুঁটি চেপে ধরবে? মেয়েকে সুশিক্ষা দিয়ে সময়ে তাকে সুপাত্রস্থ করবে এ ব্যবস্থাও কি সে দেয় নি,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ

দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা।

আবার বলেছে—

"অজ্ঞাত পতি মর্য্যাদামজ্ঞাত পতি সেবনাম্,

নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্ম শাসনাম্।"

"বার চোদ্দ বছরের মেয়ে কি এমন অরক্ষণীয়া হয়ে দাঁড়ান যে শাস্ত্রের ওসব কথা ভুলে তুমি

পাগল হ'য়ে মেয়ের বিয়ের জন্যে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ ?"

বসন্তবাবু ধীর ভাবে কহিলেন—

"দেখ ভাই, কালে কালে শাস্ত্রের অনুশাসন বিধি ব্যবস্থাও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়, আমাদের দেশে মনোনয়ন, স্বয়ম্বর, এ সবেরি প্রথা ছিল, মেয়েরা বিদুষী হ'য়ে বয়স্কা হ'য়ে বিবাহিতা হতো, তাতে মেয়ের বাপের বা অন্য অভিভাবকের জাতি-পাত হতো না। কিন্তু সময়ের গতিতে সে বিধি বা সে রীতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে, সুতরাং উপস্থিত সমাজের বিধি, রীতি মেনে আমি যদি না চলি তা হ'লে আমি সমাজদ্রোহ পাপে লিপ্ত হব।"

"পথে এস ভাই, সময়ে যদি সামাজিক রীতি, বা বিধির পরিবর্ত্তনকে স্বীকার কর, তা হলে এটা কেন মান্‌চ না, যে এখনও আবার সেই রীতির বা বিধির কিছু পরিবর্ত্তনেরই যুগ এসেচে, পণ-প্রথা আমাদের দেশে এমন পীড়াদায়ক ভাবে যে ছিল না, তা নিশ্চয় মান, কিছু কাল হ'তে

সমাজের বুকে, অর্থাৎ মেয়েদের বাপেদের বুকের উপর দিয়ে সে জুড়ী গাড়ী হাঁকিয়ে ছুটেছে, তাকে রুখ্‌তে হলে এখন মেয়ের বাপকেই চিন্তাশীল হয়ে ধৈর্য্য ধ'রে সমাজের চোখরাঙ্গানী সয়ে ও মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে পাগল হ'য়ে লাগ্‌বার মতো অবস্থা ছাড়তে হয়। ছেলের বাপ যতই যা বলুন, ছেলের বিয়ে না দিলে তাঁর কোন কালে জাত যাবার সম্ভাবনা না থাকলেও বধূ রূপে গৃহলক্ষ্মী তাঁকে আন্‌তেই হবে, না আন্‌লে ঘর বাড়ী শ্মশান হ'য়ে যাবে, সংসারের শ্রী থাক্‌বে না.। সুতরাং বুঝেই দেখ, যে মেয়ে আজ তোমাদের গলগ্রহ মনে হচ্ছে, এর যে কত দাম, সমাজ আপনিই তখন তা বুঝতে পেরে, তোমারি দুয়ারে এসে ধন্না দেবে, মেয়ের জন্যে সুপাত্রের খোঁজে তোমার যেমন মাথা-ব্যথা, ছেলের জন্য সুপাত্রীর খোঁজে বরের বাপের মাথা-ব্যথা যে তার চাইতে এক তিলও কম ন', তখনই তা প্রমাণ হ'য়ে যাবে।"

"মাথা ঘামিয়ে অতো ভাববার অবসর নেই

ভাই, ভেবেই বা ফল কি, আমি কিছু একলা সমাজ নই, সবাই যদি এ পথের পথিক হয়, তা হ'লে না হয় সাহস করে সঙ্গ ধরতে পারি. নইলে সবই কল্পনা আর জল্পনা। তুমি যদি মেয়ের বাপ হয়ে পথ দেখাতে তাও না হয় দেখে সাহস হ'তো, কিন্তু তোমার তো মূলেই কিছু নেই তা আবার ফুল ফল।"

নিখিলেশ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "সে কথা বল্‌তে পার বটে, কিন্তু আমিও একথা জোর করেই বল্‌তে চাই যে যদি মেয়ের বাপের দল সকলেই তোমার মতন আহাম্মুকী ক'রে চলে তা হলে কন্যাদায় সমস্যা বাঙ্গালাদেশে দিনের পর দিন আরও জটিল হয়ে উঠ্‌বে। তার চাইতে, এ ওর পায় ধরবার প্রত্যাশা ছেড়ে দিয়ে নিজে নিজেই যদি অগ্রসর হয়ে মেয়ের বিয়ে দেবো না পণ ক'রে বসো তো দেখ, বরের বাপদের গুমোর ভাঙ্গে কি না।"

বসন্তবাবু আসিয়া কহিলেন "মেয়ের বাপ

হওনি বলেই এতো গলাবাজী করতে পারচ হে, হ'লে পরে গলার সুর অন্য রকমের হতো। ওরে ঘন্টি, তোর কাকার জন্যে আর গোটাকতক পান দিয়ে যা রে, অমল টিকেটা একটু ধরিয়ে আন্‌তো, আর একছিলিম খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

অতঃপর নিখিলেশ তাম্বুল চর্ব্বণে ও বসন্ত বাবু হুক্কা সেবনে মন দিলেন।

৭

খাবারের রেকাবী ও চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া মৃদু পদে শান্তা যখন দাদার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল, সুধাকান্ত তখন বুঝি নিবিষ্টমনে পাঠাভ্যাস করিতেছিল, সে জন্য শান্তার আবির্ভাব জানিতে পারিল না। দাদার হাতে একখানি মোটা বই খোলা রহিয়াছে দেখিয়াও শান্তা বেশ বুঝিতে পারিল দাদার ধ্যান মগ্ন অবস্থা হইলেও এ ধ্যান মা সরস্বতীর উদ্দেশে নয়, এ কোন মানব-দুহিতারই প্রতিমূর্ত্তির ধ্যান। পিঠের দিক হইতে

চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়াই সে দেখিয়া লইল দাদার হাতের খোলা বই খানির মধ্যে একখানি ফটো রহিয়াছে, সে ফটো পূর্ব্বদিনে সুন্দরী ঘটকী দিয়া গিয়াছে, গৃহিণী যাহাতে একমাত্র পুত্রের ভাবী বধূকে চাক্ষুষ না দেখুন, অন্ততঃ ফটো দেখিয়া রূপটা যাচাই করিয়া লইতে পারেন।

সুধাকান্তর সম্মুখে গিয়া টেবিলের উপর চা ও খাবারের রেকাবী রাখিতেই সুধাকান্ত চমকিয়া উঠিয়া বই বন্ধ করিয়া কহিল, "তুই খাবার আনতে গেলি কেন শান্তা, আমি কি যেতে পারতাম না?"

শান্তা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তখন থেকেই তো যাচ্ছিলে, তিন চার বার ডাক দিলাম, বললে, পড়া করচ, কাজেই আমি নিয়ে এলাম। মা বললেন, 'পড়তে বসলে ওর খাবার কথা মনেই থাকে না, তুই গিয়ে দিয়ে আয় শান্তা'। এসে দেখি সত্যিই তুমি এমন বেহুঁস হয়ে পড়ায় ডুব দিয়েচ, যে কলেজ যাবার সময় হ'লেও উঠে নাইবার, খাবার কথা মনে হতো কি না সন্দেহ। এখন

চা টা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও দাদা, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার আমি সিঁড়ি ভেঙে উঠে গিয়ে গরম ক'রে আন্‌তে পারব না তা বলে দিচ্ছি ।"

সুধাকান্ত অবিলম্বে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া কহিল, "লক্ষ্মী মেয়ে তুই, তাই তো তোকে এতো ভালবাসি ।" সে স্তুতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া শান্তা কহিল, "ঐ মোটা বই খানা কি বই দাদা ?" বইখানা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীরভাবে সুধাকান্ত কহিল, "কি বই তা তুই কি বুঝবি, ইংরিজী তো বুঝিস্‌ ঘোড়ার ডিম, এখানা হ'চ্ছে "বায়োলজি ।"

"ঘোড়ার ডিম না বুঝলেও হাঁসের ডিম খুব বুঝি দাদা, দেখি না বই খানা" শান্তা বইখানাতে হাত দিবামাত্র সুধাকান্ত ফস্‌ করিয়া সেখানা সরাইয়া লইয়া কহিল, "ছবি টবি কিছু নেই কি দেখ্‌বি ? ইংরিজী অক্ষরগুলো তোকে গিল্‌তে আস্‌বে, সে দেখে তোর লাভ কি ?"

"দেখিই না একটু, তাতে তোমারি বা

লোক্সানটা কি শুনি,—বলিয়া চোথ টিপিয়া মুখ মুচকিয়া শান্তা মৃদু হাসিল। সুধাকান্ত সন্দিগ্ধভাবে কহিল,—"হাস্‌চিস্ যে বড়।"

"কেন হাস্‌তে কি দোষ আছে না কি?"

"দাঁড়া, রমণ এলে তোর সব দুষ্টুমি ব'লে দেবো, দিন দিন তুই ভারী ফাজিল হচ্ছিস্।" ঠোঁট উল্টাইয়া শান্তা কহিল "তবেই তো ভয়ে আমি পিঁপড়ের গর্ত্ত খুঁজতে গেলাম আর কি। বই না দেখাও বয়ে গেল, তুমি যে বল্‌চ ব'য়ে ছবি নেই, আর আমি যদি ছবি বের কর্‌তে পারি?"

সুধাকান্ত শান্তার হাসির মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া কহিল, "দেখেচিস্ তা হলে—আচ্ছা দেখ্ তবে,—কিন্তু মাকে যেন বলিস্ না কিছু।"

শান্তা তখন বই লইয়া ফটো বাহির করিয়া দেখিয়া কহিল, "মেয়ে তো দেখ্‌তে বেশ দাদা, তবে রঙ্ ফর্সা কি কাল তা—তো ফটোতে বোঝবার যো নেই।"

সুধাকান্ত আহার শেষ করিয়া তোয়ালেতে

মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "কাল নয়, তোর গায়ের রঙ্।"

"খুব ফর্সাও নয় তা'হলে। কিন্তু তারা বড় লোক নয় শুনেই তো মা পিছিয়েচেন, বল্‌ছেন, গরীবের ঘরে একটি মাত্র ছেলের বিয়ে দিয়ে কুটুমের সুখ হবে না, তারা ভাল করে তত্ত্ব-তাপাস কর্‌তে পার্‌বে না, জামাই মেয়েকে তেমন গুছিয়ে কাপড় চোপড় দিতে পার্‌বে না, যা আমি দশ জনার সুমুখে বের কর্‌তে পার্‌ব।"

সুধাকান্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যার ঘরে এতো জিনিস, এতো পয়সা, তবু সেই পরের পয়সায় নজর, মাকে বলিস্ আমি বিয়ে কর্‌ব না শান্তা।"

শান্তা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "সত্যি না কি? তোমার বুঝি এ মেয়েকে খুব পছন্দ হয়েছে দাদা, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে বইএর ভিতর ফটো রেখে দেখ্‌ছিলে?

"হয়েচেই তো, ফটো দেখছিলাম বাড়ার ভাগ, কনেকে আমি চোখে দেখে এসেছি।"

"সত্যি ?" বলিয়া বিস্ময়ের সহিত শান্তা দাদার মুখের দিকে চাহিল, সেও নববিবাহিতা তরুণী, অভিভাবকদের লুকাইয়া তাহার বরও একবার তাহাকে সম্বন্ধ হইবার সময় দেখিয়া গিয়াছিল, সুতরাং এ ব্যাপারটি বেশ কৌতুকজনক বলিয়া তাহার নিকট উপভোগ্য রূপে অনুভূত হইল, সুধাকান্ত উত্তর করিল—

"সত্যি না তো কি মিথ্যে বল্‌ছিরে, তুই যেন মাকে সব কথা বলে দিস্‌ না, তা হলে তোকে আর কিচ্ছু বল্‌ব না, আর বায়স্কোপও দেখাতে নিয়ে যাব না।"

"না, না, মাকে কেন বল্‌তে যাব ? আচ্ছা, মেয়েটি কত বড় হবে, আমারি বয়সী বোধ হয়,— না দাদা।"

"তাই হবে, পড়াশুনা, কাজকর্ম্ম সব জানে, নামটিও বেশ মিষ্টি—'নীলীমা' তবে 'বুড়ি' বলেই সবাই ডাকে শুন্‌লাম।"

"আমার তো তার সঙ্গে এক্ষুণি ভাব করতে

ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার যখন পছন্দ হ'য়েচে, তখন এইখানেই বিয়ে হওয়া চাই দাদা,—মা, বাবা, না বল্‌লেই হ'লো কি না—"

কথাটা জোরের সহিত বলিবার মূলে বিশেষ কারণ ছিল, কেন না, রমণ শান্তাকে দেখিয়া গিয়া মাতার পছন্দ মত অন্য একটি সুন্দরী পাত্রীকে উপেক্ষা করিয়া শান্তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া জিদ করিয়াছিল, পিতামাতা সে জেদ বজায়ও রাখিয়াছিলেন। শান্তার বাপ অবশ্য মেয়ের শ্যামবর্ণ রঙের জন্য কিছু মূল্য বেশী রকম ধরিয়া দিয়াছিলেন।

সুধাকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "সীতেশও আমার সঙ্গে গেছ্‌ল, সেও সব জানে, আর এখন তুই জান্‌লি, সুন্দরীকে মা কাল ফটো দেখে কি কি বল্‌লে কিছু শুনেচিস ?"

"শুন্‌ব না তো কি, আমি তো সেখানে বসে। তোমার রাক্ষসগণ ব'লে নরগণের মেয়ের সঙ্গে তো বিয়ে হ'বে না, তাতেই অনেক সম্বন্ধ ঘুরে

যাচ্ছে, এ মেয়ের দেবগণ বলে মার মনে লেগেচে, রঙ্ খুব ফর্সা নয় শুনে খুঁৎ খুঁৎ করচেন। ঘটকীকে বল্লেন, তার বাপকে জিজ্ঞেস করে এসো কত টাকা দিতে পারবেন, আমরা হাঁক্‌লে তা অনেকই হাঁক্‌ব, তাঁরা কত দেবেন জান্‌তে পারলে না হয় সেই বুঝে, অল্প স্বল্পর মধ্যেই সেরে নেব। টাকার আঁচটা শুনে তবে বাবাকে মেয়ে দেখ্‌তে পাঠাবেন বল্লেন।"

"সত্যি আমাদের দেশটা কি বিশ্রী, টাকা না হ'লে বিয়ের কথা কইবার যো নেই, এই পণ প্রচার জন্যে দেশে যে কত দুঃখের চাপ লোককে সইতে হচ্ছে, তা কেউ ভাবে না—"

"অন্ততঃ তোমার আমার মতন Young Bengalদের তো ভাবা উচিত, তবে আমার মতন চাল চুলো হীনের হয়ে কেই বা হাঁক ডাক করবে। তোমার মত পাঁঠার দাম বাজারে চড়াবার লোক যখন রয়েছে, তখন তো হবেই, লোকেও দাম দিয়ে কিন্‌বে। এই সেদিন আমরাও তো

কেমন একটা বোকা পাঁঠা কিনেছি। পাঁচহাজার রূপেয়া নগদ গুণে দিয়ে, কি বল্ শান্তা, ঘাস জল খায় কেমন রে? শিং টিং নাড়ে না তো?"

শান্তা কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফুলাইয়া কহিল, "দাঁড়াও সীতুদা, মাকে বলে দিচ্ছি তুমি দাদাকে মেয়ে দেখাতে নে গেছ্‌লে।"

সীতেশ সভয়ে বলিয়া উঠিল, "এই সর্ব্বনাশ, সুধা, তুমি এ মেয়েটাকে সব বলে ফেলেচ? মেয়েছেলের পেটে কি কথা হজম হয়? এক্ষুণি বড় মাসীমা শুন্‌তে পেয়ে ঝাঁটা হাতে ক'রে তেড়ে আস্‌বেন—বলবেন "সুধা তো কচি ছেলে, ভাজামাছটি বাছা আমার উল্টে খেতে শেখেনি, এ সব সীতু ছোঁড়ারই ফন্দী।"

সুধাকান্ত অভয়বাণী প্রচার করিল—"না, না, শান্তা সে মেয়ে না, সে মাকে কিছু বল্‌বে না, আজই সন্ধ্যের সময় তোকে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' বায়স্কোপ দেখিয়ে আন্‌ব রে শান্তা। ওহে সীতেশ, শান্তাকে দলে নাও, এর দ্বারা কিছু কাজ হবে। ও বেশ

চালাক চতুর, শুনেছ তো মায়ের কথা—ঘটকীকে দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠিয়েছেন যে তারা কত টাকা দিতে পারবে। তাদের যা অবস্থা, অমলের কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে সবই শুনেচ তো—এতে কার না Pity হয়?"

সীতেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তোমার আমার রোমাণ্টিক প্রাণের pity হওয়া বিচিত্র না। তা ব'লে বড় মাসিমার যুক্তির কাছে এসব 'পিটি' 'ফিটি' কিছুই না,—ভাই, সঞ্জয় সে দিন লেক্‌চার শুন্‌তে গিয়ে ধাঁ করে সই করে ফেল্‌লে যে পণ নিয়ে বিয়ে কর্‌বে না, তুমি যদি তা করে ফেল্‌তে তা হলে বরং মাসীমার কাছে বল্‌তে পারতে যে প্রতিজ্ঞা করেছি সুতরাং পণ নিয়ে বিয়ে করতেই পারি না।"

সুধাকান্ত কহিল, "সঞ্জয়ের কথা আলাদা, সঞ্জয়ের বাবা, মা সঞ্জয়কেই ভয় করে চলেন। আমি যদি সেদিন প্রতিজ্ঞাপত্রে সই ক'রে আসতাম, তা হ'লে বাবা সোজা আমায় দরোজা

খুলে রাস্তায় বেরুবার পথ দেখিয়ে দিতেন, যার চেঁচানীতে বাড়ীতে পুলিশের লোক পর্য্যন্ত ভিড় করে দাঁড়াত, আর তুমিও মাঝে থেকে গালমন্দ বকুনী খেতে। যেহেতু তুমি তো খাঁ করে সই করে ফেল্‌লে, তোমার দেখেই আমি করেচি, এইটেই. ওঁরা মেনে নিতেন।" সুধাকান্তর পিঠ চাপড়াইয়া সীতেশ কহিল—"সাবাস্‌ ভাই সাবাস্‌, অগ্র পশ্চাৎ ভেবে কাজ করবার তোমার ক্ষমতা আছে বটে, সুতরাং পশ্চাত্তাপ তোমার কুষ্ঠিতে বিধাতা লেখেন নি। শান্তা, পালা শীগ্‌গীর, বড় মাসীমা ডাক দিচ্ছেন, বিয়ের ভাবনা ছেড়ে বই খুলে বোসো সুধাকান্ত। আজ কলেজে মিষ্টার রায়ের 'ফিজিক্‌স' সম্বন্ধে লেকচার—একটু সকাল সকাল যেতে হবে।"

৮

রাত্রি প্রায় আটটার সময় নিখিলেশ বাড়ী ঢুকিয়া উঠানের দরোজা বন্ধ করিতেই পুণ্যদা আহ্নিকে বসিয়াই উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "অ কমলা তোর দাদা এল নাকি, কে দুয়োর বন্ধ করে দেখ্ না, যে ঘুটঘুটে অন্ধকার, চোর ছেঁচড়ও তো ঢুক্‌তে পারে, আলো নিয়ে ছ্যাখ্। জুতার মস্ মস্ শব্দ করিতে করিতে নিখিলেশ ভাঁড়ার ঘরের সামনে আসিয়া কহিলেন, "আহ্নিক করচ তুমি? সেরে নাও, আস্‌তে আমার রাত্তির হয়ে গেছে।"

"সেই কোন্ সকালে একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে বেরিয়েছিলে আর এতক্ষণে বাড়ী ঢুক্‌লে, কমলাকে ডাক, খাবার বেড়ে খেতে দিক, তুমি হাত মুখ ধুয়ে বসগে, আমি এলাম বলে।"

"কিছু তাড়াতাড়ি নেই, তুমি স্থির হয়ে ইষ্ট-দেবতার নাম কর, আমি খাওয়া সেরে এসেছি।"

পুণ্যদা অসন্তোষের সহিত কহিলেন, “তোমার তো অর্দ্ধেক দিন বাজারের বাসী পচা খেয়ে দিন কাটান রোগ আছে, ঘরের পাঁচ ব্যঞ্জন অন্ন তোমার কপালে জোটে কই? আজ দিব্যি একটি রুইমাছের মুড়ো কিনেছিলুম, সেইটির মুড়িঘণ্ট রেঁধে রেখেছিলুম্, তা তোমার আর দেখা নেই, ও জিনিষ তুমি ছাড়া মুখে দিতে ঘরে কেই বা আছে বল, আমার যেমন বরাত।” এখনি বরাতের অনেক দুর্ভোগের কথাই উঠিয়া পড়িবে জানিয়া সশঙ্কচিত্তে নিখিলেশ কহিলেন, “আজ হঠাৎ আমার কলেজের সহপাঠী বসন্তের সঙ্গে দেখা, সে ছাড়্লে না, ধরে নিয়ে গেল, দুবেলা খাইয়ে দাইয়ে তবে বিদেয় দিলে, তা তোমার মুড়িঘণ্ট বাঁধা ফেল্‌ব না, তুমি আহ্নিক সেরে উঠে নিয়ে এসো, আমি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করি।”

পুণ্যদা তখন আশ্বস্তচিত্তে আহ্নিকে মন দিলেন, নিখিলেশ দোতালার সিড়িতে উঠিবার

সময় দেখিলেন, কমলা হ্যারিকেন হাতে নামিয়া আসিতেছে। নিখিলেশ কহিলেন, "উঠে চল, আর আলো দেখিয়ে দরকার নেই, তোমার দাদা অন্ধকারেও দেখ্‌তে পাবার শক্তি রাখে, বয়স ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে চল্লেও সে তো মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবে বুড়িয়ে যায় নি যে চোখে চাল্‌সে ধরবে।" কমলা হাসিয়া কহিল, "হঠাৎ তোমার এতো বক্তৃতা সুরু হলো কেন দাদা?"

"বল্‌চি, দাঁড়া" বলিয়া ঘরে আসিয়া জুতা খুলিয়া কোট ও গায়ের কাপড় কমলার হাতে দিয়া নিখিলেশ বিছানার উপর সটান্ শুইয়া পড়িলেন। কমলা তাড়াতাড়ি দাদার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "অনেক হেঁটেচ বুঝি দাদা, তুমি কিন্তু ইচ্ছে করেও অনেক সময় হাঁট, ট্রামে কি গাড়ীতে ঘোরাঘুরি করলেই হয়।"

"এইবার তোর বক্তৃতা সুরু হ'লো। আমি কেন বক্তৃতা করছিলাম জানিস্, আমার সহপাঠী বসন্তর সঙ্গে হঠাৎ আজ পনের বচ্ছর পরে দেখা—

ঐ যে সামনে আমাদের কলেজের ফুটবল ক্লাবের ফটো রয়েচে, ঐ ছাখ্ না, মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা আমার ডান দিকে যে সুন্দর ছেলেটি, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল, ঐ বসন্ত,—তাকে দেখে আজ আমি অবাক্, কোনো রোগবালাই কিছুই হয় নি, বেচারী সংসারের অন্ন চিন্তা আর মেয়ের বিয়ের চিন্তায় এমন বুড়িয়ে গেছে যে এখন দেখলে আগেকার ঐ চেহারার একখানা কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না, কন্যাদায়ের ভাবনা তার বুকে জোঁকের মতন কামড়ে বসে সব রক্ত চুষে নিচ্ছে—দেখে এম্নি মায়া হলো, ভাগ্যে বিয়ে করি নি রে! করলে হয় তো আমারও ঐ দশা হ'তো।"

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"আচ্ছা দাদা, বাঙলা দেশে মেয়ে কেন জন্মায়?" কথার ভিতর মর্ম্মান্তিক দুঃখের আভাস থাকিলেও নিখিলেশ হাসিয়া কহিলেন, "যা বলেচিস্ কমলা, জন্মানই উচিত না, এক কাজ কর, তোরা

বাঙ্গলা দেশের মেয়ের দল, একখানা আর্জ্জি লিখে বিধাতা পুরুষের কাছে পেশ কর্, যেন বাঙলা দেশে আর মেয়ের জন্ম না হয়, বিধাতাপুরুষ দয়া ক'রে যদি সে আর্জ্জি মঞ্জুর করেন তা হলে দেশের চেহারা ফিরে যায়।"

কল্পনায় মুহূর্ত্তমধ্যে দেশের নারী-বর্জ্জিত সংসার শ্রীর কথা ভাবিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কমলা কহিল, "সে বেশ হয় দাদা, না? কারও বাড়ীতে আর আইবুড়ো কোন মেয়ে কিচ্ছুরই বালাই থাকে না।"

নিখিলেশ কহিল, "শুধু তাই না, 'মা'য়ের অস্তিত্বও দেশ থেকে উঠে যায়।"

এই সময় আহ্নিক সারিয়া পুণ্যদা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া নিখিলেশের শায়িত অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, "সারাদিন ঘুরে ঘুরে খুবক্লান্ত হয়ে পড়েচ, তা ঘর ব'লে তো একটু টান্ নেই যে এসে দুদণ্ড জিরিয়ে যাবে, সাধে কি বলি বিয়ে কর, বিয়ে কর, যে বয়সের যা, বউ এলে তবু ঘর টান্ হবে।"

নিখিলেশ কহিলেন, "দোহাই তোমার মা, আর ও উপদেশ দিয়ো না, বসন্তর পাঁচটি কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে তার উপর মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবে যে অবস্থা দেখে এলাম, বিয়েতে অরুচি জন্মে গেল।"

পুণ্যদা কহিলেন, "রুচির পরিচয়ও তো কখনও দিলে না বাবা, সংসার করতে হলে মেয়ের বিয়ের ভাবনা গরীবই বল, আমীরই বল, সবাইকেই ভাবতে হবে, না ভেবে কে পার পাবে? তা বলে কি সবাই তোমার মতন 'ভীষ্ম' হয়ে বসে থাকবে? তোমার যে সব বাড়াবাড়ি বাছা, আমার এ বয়সে আর সংসার আগ্‌লে ব'সে থাকা ভাল লাগে না, তীর্থ ধর্ম্ম করে বেড়াই সেই ভাল, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসে ঘরকন্না করবে আমি তোমায় সংসারী দেখে নিশ্চিন্ত হই।"

নিখিলেশ সে কথার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া হাতের কাছে একখানা বই ঠেকিতেই সেখানা তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "এ কি

.৬৫

বইয়ে কমলা, প্রহ্লাদ চরিত্র আর আলিবাবা, এ কাদের বইয়ে ?"

কমলা কহিল, "ওবাড়ীর ওরা কাল ঐ থিয়েটার দেখতে যাবে, মাকে আর আমাকে যাবার জন্যে বলেচে, তাই বইখানা এনে পড়ে নিচ্ছিলাম, তা হলে দেখতে সুবিধে হয় কি না।"

নিখিলেশ মুখ কাল করিয়া কহিলেন "হাঁ মা, তুমি কমলাকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাবে ?"

পুণ্যদা কহিলেন, "ঠাকুর দেবতার পালা দেখতে দোষ কি, বলেই যাব, নেহাৎ একলাটি বাড়ীতে চুপ চাপ করে থেকে ওরও তো মন হাঁপিয়ে ওঠে, ছেলেমানুষ, এই বয়সে সাধ আহ্লাদ সব পুড়ে গেল।"

"তাই থিয়েটার দেখিয়ে সাধ আহ্লাদের অভাব পূর্ণ করবে, এ আমি ভাল মনে করি না মা, ওকে এ সব বাজে বই পড়তে দিতে তোমার একটু ঠেকে না, অথচ আমি সময় মত একটু ভাল বই

টই পড়াতে চাইলাম, স্কুলেও দেবার কথা বল্‌লাম, তুমি হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্‌লে।"

পুণ্যদা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর দেবতার বই তো বাজে বই নয় বাছা! তোমরা যেমন ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পুড়িয়ে খেয়েচ আমরা তো তা পারি না?"

"অলিবাবাখানাও কি ঠাকুর দেবতার বই মা? তোমার গোঁড়ামির কোনো অর্থ বুঝি না আমি, ছেলেমানুষ বলে হাতও খালি করতে দাও নি, এক গোছা সোণার চুড়ী, হার, সবই পরে আছে, সাড়ী জামা সবই পরেচে অথচ লেখাপড়া শিখলেই দোষ? ভেতরে ভাল রকম জ্ঞান বুদ্ধি না হ'লে এখন যে এর সমস্ত জীবনটা পড়ে রয়েচে, সেটাও ভাল রকমে কাটাবে কি করে তা ভাব না?"

পুণ্যদা বিপরীত বুঝিলেন, কমলার সাড়ী, সেমিজ গহনা পরা নিখিলেশের চখে বিঁধিতেছে ভাবিয়া তাঁহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, কহিলেন—"সবই তো ঘুচেছে, চোখে নেহাৎ কচি মেয়ের থান

পরা শুধু হাত দেখা যায় না বলেই পাঁচ জনার কথায় খুল্‌তে দিই নি; তোমার যদি তাতে চোখ টাটায় তাহ'লে কালই সব ঘুচিয়ে দেওয়াব। শাঁখা, নোয়া সিঁদূর যে চুলোয় গেছে, ও সবও সেইখানে যাবে।"

অতঃপর,—"কপালে আমার এই ছিল গো, কবে তুমি আমায় ডেকে নেবে গো, আর যে সইতে পারি না গো" বলিয়া স্বর্গগত পতির উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন লইয়া তিনি নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কমলা নির্ব্বাকভাবে কাঠের মতন নিস্পন্দ বসিয়া রহিল। নিখিলেশ এতদূর গড়াইবে ভাবেন নাই—উঠিয়া বসিয়া কমলার সুন্দর হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তোর চুড়ি পরে থাকার জন্যে আমার যে চোখ টাটায় নি, তা তুই বেশ বুঝতে পাচ্ছিস্ কমলা— মার উল্টো বোঝা স্বভাব গেলও না, যাবেও না। এখন তোর ভালর জন্যে আমি যা ভেবেচি, অথচ

মা'র চেঁচামিছির জন্যে করতে পারি নি, এখন তাই করতে চাই শোন্, রাতদিন একলাটি মুখ বুজে থাকা তোর একঘেয়ে হয়ে উঠেচে, এ আমি বেশ বুঝচি, কাল থেকে তোকে আমি নিয়মিত যা পড়তে দেব, তাই পড়বি, আর একটা সেলাইএর কল এনে দেব। আপাততঃ আমার জন্যে রুমাল, বালিসের ওয়াড়, লেপের ওয়াড় এইগুলো সেলাই করতে শেখ্। তারপর আরও অনেক কাজ শেখ্বার আছে, ধীরে ধীরে শিখিয়ে দেব। চুপ্ করে থাকিস্ না, রাজী আছিস্ কি না, খুলে বল। পিড়াপীড়ী আমিও করতে চাই না।"

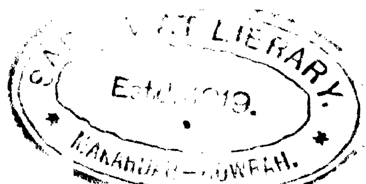
শিক্ষা বিষয়ে কমলার বেশ উৎসাহ ছিল, কিন্তু মাতার শাসনে সে দাদার উপদেশ মানিতে সাহস করিত না। নিখিলেশের প্রতি মৌখিক যতই সহৃদয়তা প্রকাশ করুন, অন্তরের মধ্যে সে যে সপত্নী পুত্র, পুণ্যদা কিছুতেই একথা ভুলিতে পারিতেন না ; কিন্তু কমলা তাহা মনেও করিতে পারিত না। স্নেহময় দাদাকে চিরশুভান্বেষী বলিয়াই

সে জানিত, বিশ্বাস করিত, তার তরুণ যৌবনে সুস্থ ও সবল শরীর ও শত আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ পূর্ণ হৃদয় লইয়া সংসারের যে দিকেই সে তার প্রসন্ন দৃষ্টি ফিরাইয়া আনন্দ সঞ্চয় করিতে চাহিত, সেই দিকেই দেখিত আগুনের অক্ষরে জ্বল জ্বল করিতেছে সেই লেখা—"নিষেধ, নিষেধ।"

তরুণ মন সহজে ভাঙিতে চায় না, শ্রান্ত, অবসন্ন হইতে জানে না, সুতরাং হতাশ হইলেও অবসাদ ভারে এখনও সে মনের সজীব ভাব মুসড়াইয়া যাইতেছে না। কিছু একটা অবলম্বন করিয়া চায় সে তার মধ্যে দিয়া বাসনার বিকাশ বিচিত্র প্রকাশ ও স্বার্থকতা। দাদার নিকট মধ্যে মধ্যে দেশ বিদেশের গল্প শুনিয়া, ঐতিহাসিক কাহিনী শুনিয়া সে সব বিষয় নিজে পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভের স্পৃহা তার খুব হইত, কিন্তু বিধবা নারীর পক্ষে তাহা নিষেধ, মাতার এ শাসন বাণীকেও সে লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না। এক তো গত জন্মের কোন অজ্ঞাত পাপে, সংসারের

রঙ্গমঞ্চের সব দৃশ্যগুলির মধ্যেই তার প্রবেশের অধিকার রহিত হইয়া গিয়াছে। আবার এ জন্মের জ্ঞাত ত্রুটিতে যদি আর একটি জন্মের জন্যও এই নিষেধের জের টানিতে হয়, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ !

কিন্তু এখন দাদার স্নেহপূর্ণ কথাগুলির মধ্যে যে সাড়া শুনিতে পাইল, তার মধ্যে তার অনেক মঙ্গল লুকাইয়া আছে ইহাই তাহার বিশ্বাস হইল। সে মৃদুকণ্ঠে তাই উত্তর দিল, "আমি তোমার কথাই শুন্‌ব দাদা।"



৯

আজ কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি। সুধাকান্তদের বাড়ী দুই পুরুষ হইতে এ পূজার অনুষ্ঠান বেশ ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সুধাকান্তর অপুত্রক প্রপিতামহ এই পূজার প্রসাদে পুত্রসন্তান লাভ করিয়া, সসম্মানে পূজাটিকে গৃহ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। উত্তরাধিকারীরা তাহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে কোনো দিনই ত্রুটি দেখান নাই। পূজা উপলক্ষে বাড়ীর মধ্যে বেশ সজাগ ব্যস্ততা দেখা যাইতেছে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই এ বাড়ীতে আজ নিমন্ত্রিত, গৃহিণী আশালতা কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত মুখে জল দিবার অবসর পান নাই। ছোট বোন প্রীতিলতা আজ দিদির গৃহে নিমন্ত্রিতা। তিনি দুইটার সময় আসিয়া তখনও দিদি বাসীমুখে জল দেন নাই শুনিয়া

সস্নেহ অনুযোগান্তে নিজেই উদ্যোগ করিয়া খাবার গুছাইয়া আনিয়া দিদিকে খাওয়াইতে বসিলেন। আহারে বসিয়া আশা কহিলেন, "তোকে একটু সকাল সকাল আসতে হতো প্রীতি, সঞ্জয়কে তো কাল বলেই দিয়েছিলাম যে মাকে বলিস্ সকালে যেন ওবাড়ীতে হাঁড়ী না চাপায়, এইখানেই সবাই খাওয়া দাওয়া করবে।"

প্রীতী কহিলেন, "ভগ্নীপতিটি কেমন তা জানইতো দিদি, সকাল না হতেই কোথায় বেরিয়েছিলেন, কাজেই না বলে আর বাড়ী ছেড়ে সবাইকে নিয়ে আসি কি করে। তা ছাড়া তাঁর তো সেই জানই ইক্‌মিক্ কুকারের রান্না না হলে হবে না। অজয়ের পেটের অসুখ, পোরের ভাত• চাই, কাজেই সকালে আর এলাম না। উনি এলেন বেলা তখন বারটা, বল্‌লাম, দিদি কত রাগ করবেন যাওয়া হলো না, তা বল্‌লেন, "তোমরা গেলেই পারতে। তারপর বৈকালের দিকে আমিও গিয়ে দিদির প্রসাদ নিতাম।" কথাবার্ত্তার মধ্যে

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া শান্তাকে পান আনিতে বলিয়া আশা কহিলেন—“এইখানে ব’সে আমরা কুট্‌নোটা কুটে ফেলি আয়, গিরির মা আলু কুমড়ো আর বেগুণ দিয়ে যাক, ছোলার ডাল চাপিয়ে দিয়েছে, এক্ষুণি কুটনো চাইবে।”

শান্তা পানের ডিবা আনিয়া মা’র হাতে দিয়া কহিল, “পান সব সাজা হয়েছে মা,—ঠাকুর শাক ভাজা চাপিয়েছে, ডাল্‌নার কুট্‌নো চাইলে, আর কিস্‌মিস্‌ আলুবখ্‌রা বেছে দিতে বল্‌লে, চাটনি চাপাবে।”

আশা কহিলেন, “গিরির মাকে বল্‌ ঝুড়ি করে তরকারী গুলো দিয়ে যাক, কুটে দিচ্ছি, তুই আমার জর্দ্দার কৌটোটা দিয়ে ভাড়ার ঘর থেকে আলুবখরা কিস্‌মিস্‌ বের ক’রে দিগে, আমি বেছে রেখে এসেছি।”

শান্তা চলিয়া গেল, ঝুড়ি করিয়া তরকারী আসিল। দুই বোনে কুটিতে বসিয়া ঘর সংসারের গল্প জুড়িলেন। সে সব কথার মধ্যে সুধাকান্তের

বিবাহের প্রসঙ্গও উঠিল। প্রীতী কহিলেন, "হ্যাঁ দিদি, সুধার গণ আর রাশ নিয়ে যখন সহজে মিল পাচ্ছ না, তখন এই মেয়েটির সঙ্গেই ঠিক করে ফেল না, শুন্‌লাম কুষ্ঠি না কি বেশ মিলেচে—তবে আর আপত্তি কি ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দিদি কহিলেন—"মেয়ের বাপ যে নেহাৎ ছাপোষা ভাই—জেনে শুনে অমন গরীব ঘরে কুটুম করি কোন্ সুখে ? মেয়েটির যা হোক্ বড় ঘরেই কুটুম করেছি। একটি ছেলে, দরিদ্দিরের ঘরে কুটুম করলে কাজকর্ম্মের কিছু সুখ হবে না। বিয়ের সময় দু পাঁচ হাজার তো দিতেই পারবে না—গা সাজানো গয়না দেওয়া তো দূরের কথা—"

"কত টাকা দিতে চায় ?"

"পোড়া কপাল আমার, মারামারি করে বারশ টাকা দেবে বল্‌চে। সে টাকায় আমার লোককুটুম খাওয়ানই হবে না, তা বাজনা আলোর খরচ। একটি ছেলের বিয়ে, একটু ভাল করে

রোসনাই না করলে—বাজী পোড়ালে মানাবে কেন ?"

প্রীতী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তুমিও যেমন পরের পয়সায় তোমার কিইবা সুসোর দেখবে। তোমায় একটি বউকে গা সাজান গয়না তুমিই দেবে। একটি ছেলের বিয়েতে ধূমধামের খরচ খরচা যাই কর, তোমার কিছুতেই গায়ে লাগ্‌বে না। মিত্তিরজার শরীর ভাল থাক, ব্যবসা বজায় থাকুক, তোমার কুটুমের ধন কড়ি দেখবার দরকার কি দিদি !"

"সে তো বটেই,—তবে কিনা মেয়ে কিছু আহা মরি সুন্দরী নয় যে মিনি পয়সায় লুফে নেব। তা ছাড়া, বিয়ের সময় না হয় নিজের খরচ পত্তর দিয়েই মানিয়ে নিলাম, কিন্তু পাঁচবারে পাঁচখানা কুটুমবাড়ীর তত্ত্ব যে আস্‌বে, পাঁচজনা লোকের কাছে তা বের কর্‌ব কি ক'রে ? আর তুই যা বল্ ভাই, গরীবের ঘরের মেয়ের দৃষ্টিও ছোট হবে, মনও ছোট হবে।"

ইতিমধ্যে সীতেশ আসিয়া মাসিমার ডিবা হইতে পান লইয়া সেইখানেই বসিয়া চিবাইতে সুরু করিয়া দিল। সে যেন মাসীমাদের কথায় মনোযোগ করে নাই, এই ভাবে একখানা বঁটি টানিয়া লইয়া কহিল, "ওগো বড় মানুষের ঝিরা, বেগুণ ভাজা এই রকম করে কুট্‌বো না কি দেখ ?"

আশা বলিয়া উঠিলেন, "মা আমার কপাল, ও যে ভাতের ভাজা হলো রে, লুচির বেগুণ ভাজা কি অমনিই তোমরা ঘরে খাও, তোমার বাপ জ্যেঠার ঘরে বোধ হয় ঐ রকম কোটে, এই স্থাগ লুচির বেগুণ ভাজা দুখানা ক'রে মাঝে একটু ছে দিয়ে দে, বাস্। খুব বড় গুলো না হয় চারখানা করে দে।"

সীতেশ মাসীমার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভালমানুষের মত কহিল, "হ্যাঁ বড় মাসীমা, তোমার বাবা বুঝি জমীদার ছিলেন ?"

তারপর প্রীতীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল,—

"হ্যাঁ ছোট মাসী, তুমি কার মেয়ে—জজের না হৌসের মুচ্ছুদ্দির ?"

আশা কহিল, "ছেলের ডেঁপোমী শোনো, তোর ও মাসীর বাপ আর আমার বাপ আলাদা না? তোর আর রজতের বাপ বুঝি আলাদা আলাদা রে ?"

চতুরা প্রীতী সীতেশের প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, "আমরা জমিদারের কি জজের মেয়ে নই বাবা, আমরা গরীবেরই মেয়ে, বাপ আমাদের জমীদারের পনের টাকা মাইনের মুহুরী ছিলেন, কিন্তু পয়সা না থাক্‌লেও তাঁর তার চাইতেও দামী জিনিষ সম্বল ছিল, সে তাঁর মহৎ মন।"

আশা কিন্তু ধনে মানে প্রতিষ্ঠাতা হইয়া পর্য্যন্ত পিতৃকুলের দরিদ্রতার উল্লেখ করিতে পছন্দ করিতেন না। সুতরাং প্রীতীর কথা শুনিয়া সীতেশকে কহিলেন, "তোর হঠাৎ আজ মাতামহর খোঁজে কি দরকার পড়ল রে? কখনো তো

নাম গন্ধ করিস্ না, গয়ায় পিণ্ডি টিণ্ডি দিতে যাবি না কি ?”

সীতেশ কহিল, “পিণ্ডি দিতে না গেলে বুঝি আর জিজ্ঞেস করতে নেই ?” তারপর ছোট মাসীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “ছোট মাসী, তোমার ছেলে তো বাছা প্রতিজ্ঞাপত্রে সই ক'রে বসে আছে যে বিনা পণে বিয়ে করবে, তোমার কপালে তা হ'লে আজকালকার বাজারে পূরো লোকসান।”

আশা কহিলেন, “ছেলে মানুষ সঞ্জয় তার আবার প্রতিজ্ঞা, ঐ তো কর্ত্তা বলেছিলেন, যাঁরা সভায় পাণ্ডা সেজে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁদেরই কে একজন ছেলের বিয়েতে সাত হাজার টাকা গুণে নিয়েছেন। ও সব বাজে কথা রেখে দে বাছা।”

প্রীতী কহিলেন—“অন্যে কে কি করেছে তা শোনবার দরকার কি দিদি। নিজের কাজ নিজে ক'রে গেলেই হ'লো। সঞ্জয় যখন প্রতিজ্ঞা করেছে

তখন তা রাখতে হবে বৈ কি। সে তো নেহাৎ বালক নয়, বাইশ বছরের ছেলে, ভাল মন্দ বোঝবার জ্ঞান তার খুব হয়েছে। উনি শুনে বল্‌লেন, ও যদি পণপ্রথা মন্দ মনে করে থাকে তা হলে আমাদের তাতে কথা কওয়া উচিত না।”

অসন্তোষের সহিত আশা কহিলেন—“কিন্তু বাপ মা থাক্‌তে ছেলেদের অতো স্বাধীন মত হওয়া ঠিক না। প্রীতী এখুনি যদি ওরা ঘোঁড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে শেখে, তা হলে দুদিন পরে আরও কি করবে।” প্রীতী সে কথার উত্তর না দিয়া কোটা তরকারী গুলি ঝুড়িতে ভরিয়া তুলিতে মন দিলেন। দিদির সহিত তাঁর সকল সময় মতের মিল না হইলেও জোর গলায় তাঁর মতকে তিনি অস্বীকার কখনো করিতে পারিতেন না, অথচ নিজের মতের জোর তা বলিয়া যে একটুও কম হইত তাহাও না।

১০

সন্ধ্যার সময় শত শত প্রদীপমালায় সজ্জিত হইয়া বৃহৎ ত্রিতল বাড়ীখানি আলোকান্বিতা হইয়া দর্শকগণের দৃষ্টি লুব্ধ করিতে লাগিল, বিস্তৃত দর দালানে দেবতার স্থানে অ্যাসিটিলিন গ্যাস জ্বলিয়া প্রতিমা মূর্ত্তিতে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিল। আরতি দেখিবার জন্য লোকের ভিড় জমিয়াছিল। আরতি শেষ হইলে বাড়ীর কম্পাউণ্ডে বাজী পোড়ান হইতে লাগিল। তখন সেখানে সকলে জমা হইল, দোতলার বারেন্দায় দাঁড়াইয়া আশা ও প্রীতীও বাজী পোড়ান দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহারা দেখিলেন, দুটি ফিট্‌ফাট যুবক একটি বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া কার্ত্তিক দর্শনে আসিয়াছে। বৃদ্ধা ঠাকুর প্রণাম করিতে বসিয়া সম্ভবতঃ দেবতার চরণে কিছু নিবেদন জানাইতেছিল। একটি যুবক সেটুকু বিলম্বও সহিতে না পারিয়া তাড়া দিল, "ঠাকুর প্রণাম

হলো ঠাকুর মা? ওঠো শীগ্‌গীর তোমায় বাড়ী পৌঁছে আমরা বায়স্কোপে যাব।"

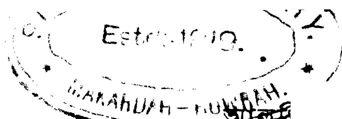
বৃদ্ধা উত্তর দিল না, কিছুক্ষণ পরে প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তোরা মাথা একটু নোয়ালি? দেবতার থানে মাথা একটু নীচু করলে অপমান হয় না রে?"

প্রথম যুবক কহিল, "দেবতার কাছে মাথা না হয় নোয়ালাম, জামাইবাবুর কাছে নোয়াতে যাব কেন?"

দ্বিতীয় কহিল, "জামাইবাবুর ময়ূরের কাছেই বা নোয়াব কিসের জন্য।"

বৃদ্ধা বেচারী ভালমানুষ, উহাদের কথার মার প্যাঁচ বুঝিতে পারে নাই, প্রশ্ন করিল, "জামাইবাবু আবার কে?"

প্রথম কহিল, "ঐ তোমার কার্ত্তিক ঠাকুর। জামাইবাবু না তো কি ঠাকুর মা, কেমন দিব্যি কালা পেড়ে কোঁচান মিহি ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে পাম্পসু, পানের রঙে ঠোঁট রাঙা



টুক্‌টুক্ করছে, মাথায় দিব্যি ফ্যাসানের টেড়ি, বাকি শুধু মুখে একটি সিগারেট,—তাও আমার কাছে আছে ধরিয়ে দিতে পারি।”

দ্বিতীয় কহিল, “এমন না হলে দেব সেনাপতির চেহারা মানায়? জামাইবাবু যখন যুদ্ধে গেছলেন তখন টেড়ি সাম্‌লে ছিলেন—না হাতিয়ার চালিয়ে ছিলেন তাই ভাবি—

বৃদ্ধ পূজারী ব্রাহ্মণ এতক্ষণ আপনার মনে নৈবেদ্যগুলি গুছাইয়া বাঁধিতে ব্যস্ত ছিলেন, এই-বার কথা কহিলেন—“বাপু হে, তোমাদের রুচির মতন তোমরাই কালে কালে দেবতার পোষাক বানিয়েছ, দেবতা যে তোমাদেরই হাতে এখন।”

দ্বিতীয় যুবক প্রশ্ন করিল, “হ্যাঁ ভট্‌চাজ ঠাকুর, যখন আমরা দেবতার হাতে ছিলাম, তখন দেবতার কি মূর্ত্তি, কি পোষাক ছিল, বর্ণনা করতে পার?” বৃদ্ধা অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, “ঘর যাবি তো ফিরে চল্ বাছা। দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে তর্কাতর্কি করতে হবে না।”

তখন সকলে চলিয়া গেল, আশা কহিলেন, "কি সব আজ কালকার ডেঁপো ছেলে, ঠাকুর দেবতাকে একটু মানবার নাম নেই, ঠাকুরের হাতে কি না সিগারেট দিতে চায় ? পাপ, পুণ্যি কিছু মানে না। এরা,—তাতেই বলে কলিতে চার পো অধর্ম্ম।"

প্রীতী উত্তর দিলেন না, শান্তা ছুটিয়া আসিয়া মা'কে খবর দিল, "মা, মা, মেসোমশায় এসেছেন।" আশা মুখ ফিরাইয়া আসিবার পথে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"তবু ভাল, যে গরীবের বাড়ী পায়ের ধূলো দিলেন। অ—গিরির মা, শাঁকটা আন্‌তো লো। ফু দিই, আমার বোনাই বাবু এসেছেন"।

বলিতে বলিতে দীর্ঘাকার কৃশকায় সত্যানন্দবাবু আসিয়া দেখা দিলেন। শ্যালিকার মধুর বচনে আপ্যায়িত হইয়া হাসিমুখে কহিলেন, "শাঁক বাজালে মানাবে না, ঠাকুর ঝি, বিউগল্‌ বাজাতে পার তো মানায়।" আশা কহিলেন, "আমি

ভাই সেকেলে মানুষ, ওসব বাজনার ধার ধারি না, জানি শুধু মঙ্গল কাজে শাঁখের ধ্বনি কর্‌তে। বলি এতো কি পায়া ভারী হয়েচে মশাই, যে এক সহরে বাস করেও নমাসে ছমাসে টিকি দেখবার জো নেই। তিনবার করে নেমন্তন্ন করে তবে আজ পায়ের ধূলো দিলে, আচ্ছা বড় মানুষ হয়েছ বটে।"

বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িয়া সত্যানন্দ কহিলেন, "সে কথা বল্‌তে পার বটে, কিন্তু কি করি ঠাকুর ঝি, Businessএর জন্যে এতটুকু সময় পাই না, যে সময়ে নাই খাই। সত্যি মিথ্যে তোমার বোনই সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষী হবেন।"

আশা হাসিয়া কহিলেন, "সাক্ষী যে তোমারি খায় পরে, তার সাক্ষ্যে বিশ্বাস কি?"

মাথা চুলকাইয়া সত্যানন্দ কহিলেন, "তাওতো বটে,—তবে কি না, উনি তো প্রায় তোমার বাড়ী আসেন খবর পাই, আমারি যখন অর্দ্ধাঙ্গিনী, তখন আমারি আসা এক রকম প্রমাণ সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমার নেহাৎ দোষ দিতে পার না।"

ইতিমধ্যে কালীকান্তবাবু আসিয়া দেখা দিলেন, শ্যালীপতিকে দেখিয়া "কতক্ষণ মশাই"—বলিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সত্যানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া "আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, বসুন মশাই বসুন, আমি উপস্থিত গৃহস্বামী, আপনি আগন্তুক মাত্র"—বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, কালীকান্ত বাবু বসিয়া, সত্যানন্দকেও বসাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। শান্তা পান লইয়া আসিল। আশা কহিলেন, "একটু মিষ্টিমুখ করে পান তামাকগুলো চালালে ভাল হতো না?"

সত্যানন্দ হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "মাপ কর, জান তো ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রুগী, কুকারের সেদ্ধ ছাড়া তেল ঘির তরকারী মোটেই হজম হয় না, তবে নেহাৎ তোমার রাগের ভয়ে রাতে দু খানা লুচি মুখে দেব, এখন খেলে আর গলা দিয়ে কিছু নাম্‌তে চাইবে না, অবশ্য পানের রস ছাড়া"—

অগত্যা আশা আর কিছু বলিলেন না। কথা প্রসঙ্গে সুধাকান্তের বিবাহের কথা উঠিল, সত্যানন্দ

কহিলেন, "বাগবাজারের সম্বন্ধ কি হ'লো হে, সে তো বেশ ঘর শুনেছিলাম।"

কালীকান্তবাবু কহিলেন, "মেয়ের রঙ বড্ড কাল, অবশ্য মুখের শ্রী বেশ ছিল, বাপের অবস্থাও ভাল, দিতে থুতে পারত, তা গিন্নী সে বউ পছন্দ করলেন না।"

সত্যানন্দ কহিলেন, "জলধরবাবুর মেয়েটি তো শুনলাম বেশ সুন্দর, আমার সঞ্চয়ের জন্য সম্বন্ধ এনেছিল, তা আমি মশাই ছেলের পড়া শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে দেওয়া উচিত মনে করচি না। ছেলেরও তাই মত, কাজেই সে সম্বন্ধ কাণে তুলি নি, আপনার এখানেই ঘটককে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।"

কালীকান্তবাবু কহিলেন, "সে মেয়ের নরগণ, তারা আবার পাত্রের রাক্ষসগণ শুনে পিছিয়ে গেল, মেয়ের বিয়ে দিতেই বেগ পেতে হয় জানি, ছেলের বিয়ে দেবার সময়ও যে এতো সাত সতেরো হাঙ্গামা পোহাতে হবে তা জানতাম না।" প্রীতী কহিলেন, "বসন্তবাবুর যে মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে

সেখানে দিলে মন্দ কি মিত্তির মশাই? মেয়েও দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ না, গণ টন সব মিলেচে,— এক তারা গরীব, সে দোষটা আপনার দিক থেকে সেরে নিলে মন্দ কি?”

শ্যালীকার কথায় মিত্র মহাশয় উত্তর দিলেন, “আমার তো একার ছেলে নয় গিন্নি, তোমার দিদি এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে নেই তো? নীচেই গেছেন্ তো ঠিক, তবে সত্যি কথা বলি, উনি গরীবের মেয়ে ঘরে আন্‌বেন না। ওঁর পছন্দ অনু-যায়ী কনে খুঁজতে আমিও হয়রাণ হ’লাম।”

সত্যানন্দ কহিলেন, “শুনেছেন মশাই, কালকের কাগজে আবার একটি মেয়ের কেরোসিন তেলে পুড়ে মরবার কথা বেরিয়েছে। এও নাকি সেই স্নেহলতার Case, পণপ্রথার দোষে যে আগুন জ্বল্‌ল, এতে দেখছি বাঙ্গালা দেশের অনেক মেয়েকেই আহুতি যোগাতে হবে।” আশা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কালীকান্তবাবু কহিলেন, “ওটা মশাই বড্ড বাড়াবাড়ি, বাপ মা যখন ভরণ পোষণ,

বিবাহ সবের জন্য দায়ী, তখন তোরা এতটুকু মেয়েগুলো জলে পুড়ে মরে নাম কিন্‌তে যাস্‌ কেন? এ সব মেয়েদের ওপোর একটুকুও মায়া দয়া হয় না, উল্টে রাগ হয়। মনে করচে মরে বড্ড বাহাদুরী দেখিয়ে গেল, তা না গুষ্টির পিণ্ডি।" আশা কহিলেন,"ছেলেকে লোকে বিশ পঁচিশ বছর পোষে, টাকা খরচ করে লেখা পড়া শেখায়, আর মেয়ে কি বানের জলে ভেসে এসেচে যে তার বিয়েতে দু চার হাজার দিতে জিভ বেরিয়ে পড়বে? এ সব এক চোখো পনা আমারও অসহ্য মনে হয়, আমার মেয়ের বিয়েতে এই যে আমি পাঁচ হাজার টাকা ঢেলে দিলাম, তাতে কি আমার বুক চড় চড়িয়ে উঠ্‌লো?"

সত্যানন্দ কহিলেন, "এর মধ্যে বুঝে দেখ্‌তে হবে মানুষের সাংসারিক অবস্থা, মেয়ের বিবাহে যৌতুক দেবার ব্যবস্থা সব দেশে, সব সমাজেই চিরকাল চলে আস্‌চে, মানুষ তা দিতেও কাতর হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে ক্রমে তা পীড়নের

আকারে পরিণত হয়েছে। মেয়ের বিয়ে সময়ে দিতেই হবে, না দিলে জাত যাবে, অথচ উপযুক্ত পণ না দিলে মেয়ের বিয়েই হ'বে না, অর্থাৎ সুপাত্র জুটবে না, এখন যে গরীব, যার কোন রকমে সংসারে স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন করবার সঙ্গতি আছে মাত্র, তার কি অবস্থা হয় ভেবে দেখ দেখি ?"

আশা মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, "সে লোক তবে মেয়ের বাপ হয় কেন ?"

সত্যানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "সে একটা যুক্তি বটে, কিন্তু গরীব বলে যে তাকে ছেলেরই বাপ হ'তে হ'বে, মেয়ের বাপ সে হ'তে পাবে না, সে বিধান তুমি আমি দিলেও প্রাকৃতিক নিয়ম সে বিধানকে ভ্রূক্ষেপও করবে না, তবে এক কথা চল্‌তে পারে যে সে বিয়ে করলে কেন। বিয়েই তার করা উচিত না। কিন্তু তাই বা মান্‌তে পারি কই ; মানুষের অবস্থা সব সময় সমান থাকে না, আজ যে ধনী, কাল সে অবস্থাচক্রের পরিবর্ত্তনে

পথের ভিক্ষুক, তবে একথাও খুব সত্যি, আমাদের দেশের বাপ, যারা ঘরে খুদ কুঁড়োর সংস্থান না থাক্‌লেও বেটার বিয়ে দিয়ে বউ আন্‌বার সখ খুব রাখে; আর ছেলে গুলি, অন্য কাজে বাপ মা'র হুকুম বা ইচ্ছাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চল্‌লেও এই বিয়ের সময় সে পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়, অন্য সময়ে সে সাবালক সাজলেও এই সময়টায় সম্পূর্ণ নাবালক হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই অবস্থার যোগ্যতা না থাক্‌লেও তাকে মেয়েরই বল, আর ছেলেরই বল বাপ হ'তেই হয়।"

কালীকান্ত বাবু কহিলেন, "সে তো গেল আলাদা কথা, কিন্তু এই যে হাল ফ্যাসানে কেরোসিন তেলের আগুনে পুড়ে মরা সুরু হ'লো, এ ফ্যাসান টা তো নতুন আমদানী,—এ বাহাদুরী মেয়েদের সুরু হবার বিশেষ কারণ তো কিছু দেখি না ভাই, এ আত্মহত্যা ক'রে কেলেঙ্কারী বাড়াবার কি দরকার। বাপ মা দেবে মেয়ের

বিয়ে, তা সে যেমন ক'রেই হোক্, তোরা মাঝে থেকে পুড়ে মরতে যাস্ কেন ?"

সত্যানন্দ কহিলেন, "এ কেনর মীমাংসা যে কি করে হয়, তা কি জানি বলুন, তবে যদ্দূর মনে হয়, বাপ মা বিয়ের ভাবনায় পাগল হয়ে উঠেচে, হয়তো ভিটে মাটী বিক্রী করচে, কেউ বা মেয়েকে বড় দুঃখে অভিশাপও দিচ্ছে, এই ধিক্কারে সে পুড়ে মরে আপনাকে না হোক্ বাপ মাকে কন্যাদায় হ'তে অব্যাহতি দিতে চাইচে। এটাকে ঠিক্ আত্মহত্যা না বলে আত্ম-ত্যাগও বলা যেতে পারে। কেন না সাধ ক'রে মানুষের নিজের প্রাণটা বিসর্জ্জন দেওয়া বড় কম কথা না। এটা বড় বেশী দুঃখেই লোক ক'রে থাকে, আর নিরুপায় অবস্থাতেও ক'রে থাকে, যেমন আগেকার মেয়েরা জহর ব্রত করত"—

বাধা দিয়া কালীকান্ত বাবু কহিলেন, "আত্ম-ত্যাগই যদি একে বল্‌তে চান্, তা হ'লে চৌধুরীদের বড় ছেলে যে ঐ গলায় দড়ি দিয়ে

ম'লো, তাকেও কি আপনি আত্মত্যাগ নাম দিয়ে পাঁচজন যুবকের আদর্শ খাড়া করতে চান্?"

সত্যানন্দ কহিলেন, "তা কখন পারি? আমার,--আমার কেন, কারও বুদ্ধি এমন বিকৃত হয় নি যে ওকে আত্মত্যাগ বলবে, সংসারের অনেক খরচ, সে খরচ কিছুতেই কুলিয়ে উঠ্তে পারছিল না, উপরন্তু দেনা হচ্ছিল, এই জন্যে সে গলায় দড়ি দিয়ে মলো, একে কাপুরুষেরই কাজ বলব, অবশ্য দুঃখে কষ্টে তার মাথার ঠিক্ ছিল না, কিন্তু তা বলে আত্মহত্যা করে নিজের শিশুগুলিকে অনাথ করে, স্ত্রীটিকে পথে দাঁড় করিয়ে পালানতে তার কিছু মাত্র মহত্ত্ব প্রকাশ পায় নি, পুরুষ হ'য়ে অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম যদি করতে না পারল, তবে আর তার পৌরুষত্বের পরিচয় কি? গত বৎসর যে শ্যাম বাঁড়ুয্যের ছোট ছেলে এগ্জামিনে ফেল ক'রে বিষ খেয়ে মরলো, ওকেও কি বাহাদুরী দিচ্ছি, না বলব বড় দুঃখে জীবনে তার ধিক্কার উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই

বেচারী প্রাণ ত্যাগ করলে, ও সব মরাকে বল্‌ব মুখ্‌খুমী, কাপুরুষতা। পরীক্ষায় পাস হলি না বলেই বিষ খাবি? কেন, আর কি পরীক্ষা পাশ করবার chance তুই পাবি না? তা ছাড়া পরীক্ষায় পাশ না-ই হস্‌, জীবনে কি আর পরীক্ষা পাশ করা ছাড়া কোনো লক্ষ্যই তোর নেই যে এইটে বিফল হওয়াতেই তোর সারাজীবনের সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেল?"

কালীকান্ত বাবু কহিলেন, "কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের গলায় দড়ি দিয়ে মরা, আফিম্‌ খেয়ে মরা, জলে ডুবে মরা একটু রোগও আছে। যখন তখন শোন না, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন। শাশুড়ি গাল মন্দ করেছেন কি আফিম্‌ খেয়েছেন, সবেতেই একেবারে অধৈর্য্য। তার ওপর এখন এই কেরোসিনে পুড়ে মরা আর এক ফ্যাসান বেরুলো।"

সত্যানন্দ বাবু কহিলেন, "মেয়েরা যে

আমাদের কথায় কথায় পুড়ে মরে সে টা যে তাঁদের ধৈর্য্য গুণ কিছু কম বলে তা তো মনে করা যায় না, কেন না নিঃশব্দে তাঁরা যত রকম দুঃখ সহ্য করেন, তার একাংশও আমরা সহ্য করতে পারি না। তবে এটা ঠিক্ যে তাঁদের প্রতি এমন ব্যবহার করা হয়, যাতে তারা আজন্ম কাল থেকে এইটেই জান্‌তে আর বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হন্ যে তাঁদের জীবনের কোনো মূল্য নেই। সংসারের কাছে তাঁদের জীবন নিতান্ত একটা তুচ্ছ জিনিষ, ঠিক যেমন মাটির হাঁড়ী কুড়ি, যতক্ষণ টিকে আছে কাজে লাগচে, যেমন ভেঙে গেল, দূর করে ফেলে দিয়ে নতুন হাঁড়ী নিয়ে এসে কাজে লাগাও ব্যস্! সুতরাং কথায় কথায় জীবনত্যাগ করতে তাঁদের একটুও বাধে না, তবে একটুতেই যে তাঁরা আফিম্ খেয়ে বসেন কি গলায় দড়ি দিয়ে মরেন, এটা আমাদের ভুল ধারণা। যদিও সংসারে স্থানে স্থানে ক্বচিৎ কখনো এ ঘটনা ঘটে থাকে, তার দৃষ্টান্ত নিয়ে কিছু সাধারণের উপমা

করা চলে না। কেন না, ও একটা মানসিক ব্যাধি, ও ব্যাধি কারও কারও মনে থাকা কিছু বিচিত্র না।"

ইতিমধ্যে শান্তা নীচে হইতে আসিয়া খবর দিল, "বাবা, দাদা তোমাদের নীচে যেতে বল্লেন, কামাখ্যা বাবুর ওখান থেকে কনসার্ট এসেছে, আর জলতরঙ্গ বাজনা এসেছে,—আগে কিন্তু আমরা জলতরঙ্গ বাজনা শুন্‌ব বাবা।"

আশা কহিলেন, "বাজনা নিয়ে বসলেই তো তোমাদের সেই রাত বার টা। সত্যানন্দ, তুমি রোগা মানুষ, যা পার দুখানা খেয়ে নিয়ে বস গে ভাই।"

সত্যানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তাই কি হয়, খানিক পরে এক সঙ্গেই সবাই বস্‌বো।"

প্রীতী স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অজয় কেমন আছে, আস্‌বার জন্যে কান্নাকাটি করে নি তো?"

সত্যানন্দ কহিলেন, "তা একটু করেছিল বই

কি, একটি চকচকে সিকি হাতে দিতেই চুপ করে গেল। সঞ্জয় আর বিজয় তো আমার আগেই এখানে আসবে বলে বেরিয়েছিল, আসে নি?"

আশা কহিলেন, "এসেছিল, জলটল খেয়ে সুধার সঙ্গে বাজি কিনতে গেছিল, তার পর এসে বোধ হয় ও দিকে বাজি পোড়াচ্ছে।"

"আসুন মশাই" বলিয়া কালীকান্ত বাবু আগে ভাগে সিড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

১১

দুপুর বেলা শীতের সুখকর রৌদ্রে আহারান্তে শ্রান্ত দেহ বিছাইয়া ঠাকুরমা নাতিনীর মুখে মহাভারত পাঠ শুনিতে শুনিতে তন্দ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলেন, রেণু মাথার পাকা চুল তুলিতেছিল, ঘণ্টি পা টিপিয়া দিতেছিল। ঠাকুরমার নিদ্রাকর্ষণ দেখিয়া বুড়ি কহিল, "তুমি তো ঘুমুচ্ছ ঠাকুর মা, তবে এখন বই বন্ধ করি?"

ঠাকুর মা চক্ষু বুজিয়াই কহিলেন "উঁহু উঁহু"। রেণু কহিল, "তোমার তো সবি পাকাচুল ঠাকুর মা, এর আর কত বাছ্‌ব? আমার হাত ব্যথা করছে।"

ঘণ্টি সেই সুরে সুর মিলাইল—"আমারও হাত ব্যথা করচে ছোট দি।"

ঠাকুর মা এ সব কথার উত্তরে আর একবার কহিলেন "উঁ হু উঁ হু" রেণু ও ঘণ্টি উহার অর্থ না

বুঝিয়া দিদির মহাভারতের উপর ঝুঁকিয়া ভীম কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ ছবি দেখিতে মনোনিবেশ করিল। বুড়ি পড়িয়া যাইতে লাগিল। এই সময় প্রতিবাসিনী সুরবালা ও মহিমের মা বেড়াইতে আসিলেন। ঠাকুরমার তন্দ্রামগ্ন অবস্থা দেখিয়া কহিলেন "গিন্নি ঘুমুচ্ছেন যে, বউ মা কোথা ?" বুড়ি কহিল,"মা শুয়েছেন, আপনারা বসুন ঠান্‌দি, রেণু, ছুটে যা, কম্বল খানা নিয়ে আয় গে ঠাকুরমা ঘুমোননি, ঝিমুচ্ছেন মাত্র, অ ঠাকুর মা, ওঠ শীগ্‌গীর দেখ কারা এসেছেন।"

রেণু ছুটিয়া গিয়া কম্বল আনিয়া বিছাইয়া দিতেই "থাক্ থাক্, এই আমরা বস্‌চি" বলিয়া তাঁহারা আসন গ্রহণ করিয়াছেন কি অমনি গৃহিণী টানিয়া জড়তাপূর্ণ দৃষ্টি মেলিলেন। মহিমের মা কহিলেন, "কি দিদি, ঘুম ভাঙল, কানের কাছে নাৎনী তো খুব মহাভারত পড়ছিল হেঁকে হেঁকে।"

"ও মা মহিমের মা যে, সুরকালী যে তোমরা কবে তীর্থ করে ফিরলে ? পায়ে যে পোড়াবাত,

সহজে কি উঠে বস্‌বার জো আছে?" বলিয়া কষ্টের সহিত পা গুটাইয়া গৃহিণী উঠিয়া বসিলেন। সুরকালী কহিলেন, "আমরা কাল সব ফিরেছি। যে তীর্থের পথ, ফিরব বলে তো মনেই ছিল না, আশ্বিন মাসেই ফেরবার কথা, তা সঙ্গের লোকেরা একমাস বৃন্দাবনে রইল, একমাস কাশীতে রইল, কাজেই সঙ্গী ফেলে আর আসা গেল না।"

গৃহিণী কহিলেন, "তোমাদের পুণ্যের শরীর বোন্, মনুষ্য জন্ম নিয়ে তীর্থ ধর্ম্ম সবই হ'য়ে গেল, আবার যে "সে তীর্থ নয় বাবা বদ্‌রীনাথ; কত জন্মের তপিস্তে তাই চর্ম্ম চক্ষে এ সব দেখে এলে, আমার জন্ম পোড়া বৃথায়ই গেল। এক বাবা বদ্দিনাথ আর কাশীর বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা মা সেই কর্ত্তা থাকতে দেখে নিয়েছি; জগন্নাথ দর্শনও হ'লো না, বৃন্দাবন মথুরাও হ'লো না, বদ্‌রীনাথ তো দূরের কথা।"

বুড়ি কহিল, "আচ্ছা ঠাকুরমা, তুমি কি তোমার এই বেতো শরীর নিয়ে ঠান্‌দি'দের সঙ্গে

ঐ সব তীর্থ করতে যেতে পারতে?" ঠাকুরমা অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন, "তোর বাপের বড় পয়সা আছে কি না, তাই তীর্থ করতে যাব; সে কপাল কি আমি করে এসেছি যে ছেলের পয়সায় তীর্থ ধর্ম্ম ক'রে বেড়াব রে?"

সুরকালী কহিলেন, "কি করবে দিদি, সে তোমার নিজেরই বরাত, কথায় বলে, যে যেমন দিয়ে এসেচে সে তেমন পায়।"

কথাগুলি গৃহিণীর মনঃপূত হইল না, মহিমের মা তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আর সে যে ভয়ানক পথ দিদি, কথায় কথায় বরফের মধ্যে পুঁতে যাবার জোগাড়, সে সব কি ভয়ানক পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই রাস্তা। সে পথ দিয়ে চল্‌তে আমাদের—এমন শক্ত সমর্থ দেহও ভেঙে চুরে দেখ্‌ছ কি হ'য়ে গেছে। তীর্থ থেকে যখন ফির্‌লাম যেন এক একটি ঝোড়ো কাক, দুমাসে তবু দেখ্‌ছ কি একটু মানুষের ছিরি হয়েচে।"

আরও কিছুক্ষণ তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী চলিবার

পর মহিমের মা কহিলেন, "নাৎনি যে এই ক'মাসে এক ছেলের মার বয়সী হয়ে গেচে, বিয়ের কি করচ দিদি, এতো বড় নাৎনি সাম্‌নে রেখে মুখে ভাত জল রুচ্‌ছে কি ক'রে ?"

সুরকালী কহিলেন, "আমি তো ভেবেছিলাম বাসর জাগা বুঝি ফাঁকিতেই গেল, তা এইবার নাৎজামাই আন দিদি, আমরাও সাধ মিটিয়ে আমোদ আহ্লাদ ক'রে নি,—"

গৃহিণী কহিলেন, "পোড়া কপাল আমোদ আহ্লাদের ;—ও থুবড়ির এ জন্মে থুবড়ি নাম ঘুচবে সে আশাও আমার আর নেই বোন্, বাপের তো পয়সা নেই অথচ উঁচু নজর আছে, বেশ একটি দোজবরে ঘরে সম্বন্ধ এসেছিল, পাত্তর নিজে এসে মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেল, পাওনার নাম গন্ধ করলে না, তা—বাপ্‌মার মনে ধর্‌ল না। কোন এক বড় লোকের ছেলে এসে মেয়ে পছন্দ করে গেল, ঘটকী বল্‌লে, ছেলে নিজে পছন্দ করেচে যখন, দেওয়া থোয়ার জন্যে আট্‌কাবে না। এখন

শুন্‌চি, পাঁচ হাজারের কম তারা কথা কইবে না,—এদিকে সেই দোজবরে বরের কাছ থেকে ঘটক আসা যাওয়া ক'রে ক'রে শেষে আবার কোথায় সম্বন্ধ ঠিক্ করেচে। দেশে কি ভাত ছড়ালে কাকের অভাব বোন ? পা দিয়ে গণ্ডা গণ্ডা আইবুড়ো মেয়ে জড়ো করা যায়, বাপ মা তো তা বুঝবেন না, ধিঙ্গী আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রেখে আমার জাত জন্ম সব খোয়ালে।"

সুরকালী কহিলেন, "কাকেই বা কি বলি দিদি, আজকাল মেয়ের বে' দেওয়া এক বিষম ব্যাপার হয়েচে, আমার—এক ভাই ঝি, তারও এম্‌নি বুড়োহাতী মেয়ে আইবুড়ো হয়ে আছে, তাদের তবু দেওয়া থোওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু হ'লে কি হয় পছন্দ সই ঘর বর' মিলচে না, আমি তো দেখে তাক্ লেগে গেলাম। বল্‌লাম বয়স আর কত বাড়াবি, যা পাস্ তাই পছন্দ করে, চার হাত মিলিয়ে দে—তা বোন্‌ঝি বলে কি, মনের মতন ঘর বর না পাই মেয়ে আইবুড়ো রাখি সেও ভাল।"

বোন্‌ঝি জামায়ের অবস্থা ভাল, কাজেই লোকের নিন্দের বড় তোয়াক্কা করে না।"

মহিমের মা কহিলেন, "সে বড় বাহাদুরী কথা না, পয়সা আছে ব'লে ইহকালে যেন সবাই মেনে চল্‌ল, পরকালে তো আর পয়সার দোহাই চল্‌বে না, সময়ে মেয়ের বিয়ে না দিলে সাত পুরুষের যে অধোগতি হয়, এই সব পাপেই তো আজকাল চার দিকে এতো দুঃখু এতো কষ্ট।"

সুরকালী কহিলেন, "মেয়ের বিয়ে দেওয়াই যে আজকাল এক মহাদায় হয়ে দাঁড়িয়েচে। তা ইচ্ছে মত চট্‌পট্‌ লোক দেবে কি ক'রে? আমাদের কালে বাপু এতো পয়সার কামড়ও ছিল না, ছেলেদের পাশ করারও ঘটা ছিল না, মেয়েটি ভাল দেখে পছন্দ হ'লে গরীবের ঘর থেকেও লোকে সাধ করে শাঁখা হাতে দিয়েই বউ আন্‌ত। আজকালকার বিয়ের ফর্দ্দর জামা কাপ-ড়ের নামও কেউ জান্‌ত না। ঘরে খেতে থাক্‌ না থাক্‌, জামাইটি পাশ করা চাই, মেয়ের বাপ মার

এ জেদের বালাইও ছিল না। বরের বাপ মার আখম্বা খাঁইয়ের কথাইবা কে শুনতে পেতো—"

মহিমের মা কহিলেন, "কালে কালে যখন এ সবের চলনই হয়েচে, তখন যখনকার যা তা করতেই হ'বে, অবিশ্যি যার যেমন ক্ষমতা সে সেই রকম ঘর বর খুঁজবে, তার বেশী খুঁজতে গেলে পাবেই বা কেন?"

গৃহিণী কহিলেন, "সেই কথা তো আমিও বলি, এ কিছু খিষ্টান, মোছলমানের ঘর নয় যে ধেড়েকেষ্ট মেয়ে বুকের ওপর জিইয়ে রাখ্‌বি। তা ছেলে আমার কাণ করে কই, বউও তেমন জেদ করে না, নইলে সে কি চুপ্‌ চাপ্‌ করে থাক্‌তে পার্‌ত। যদি বল, তুমি মা থাক্‌তে বল্‌তে পার না, তা জানাই তো বোন্‌, আজ-কালকার দিনে মাকে ছেলেরা তো বাড়ীর দাসী বাঁদী মনে করে; সে কাণের কাছে যতই বকে মরুক না তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।"

সুরকালী কহিলেন, "আর শুনেচ দিদি, পরশু

নাকি কাদের আইবুড়ো মেয়ে বাপ মার ভাবনা দেখে কেরোসিন জ্বালিয়ে পুড়ে মরেচে ? হতভাগীর কি কপালের গের গো, শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।”

গৃহিণী কহিলেন, “তা একরকম বেশ করেচে, গুষ্টিবর্গ সবাইকেই রেহাই দিয়ে গেচে।”

মহিমের মা কহিলেন, “বড় বেশ না বোন্, পুলিশের হাঙ্গামায় বাড়ীশুদ্ধ সবাই উদ্ব্যস্ত হ'য়ে পড়েচে, মেয়েরও আদিখ্যেতা, বিয়ে হয়নি বলে কিসের তোর এতো দুঃখু যে পুড়ে মরতে গেলি ? বাড়ী শুদ্ধ সবাইকেই বিপদে ফেল্‌লি ?”

সুরকালী কহিলেন, “বিয়ে হয়নি বলে পুড়ে মরেচে তা আমার মনে হয়না ভাই, হয় পাঁচজনার ভাবনা চিন্তে দেখে নিজের মনে একটা ধিক্কার হয়েছিল, না হয় বিয়ে হয় না ব'লে কেউ কিছু কড়া কথা মেয়েকে শুনিয়েছিল, তার প্রাণে খুব লাগাতে এমন কাজ করে বসেচে।”

নিজ নিজ ধারণানুযায়ী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া

বর্ষীয়সীর দল কথাবার্ত্তা বেশ জমাইয়া তুলিলেন। বুড়ি ইতিপূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়া শ্রান্তভাবে ঘরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল—তার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় তাহা হইলে কি ভালই না হয়, বাপ, মা, ঠাকুরমা সবাই কন্যাদায় হইতে মুক্তি পাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। ওদিকে সরোজিনী নিদ্রাভঙ্গে শ্বাশুড়ীর মন্তব্য শুনিতে শুনিতে মনে মনে ফুঁসিয়া উঠিতেছিলেন। মেয়ের বিবাহের ভাবনায় তাঁর দিনে স্বস্তি নাই, রাত্রে সুনিদ্রা নাই, অথচ লোকে জানিতেছে তাঁহারই তাগাদার অভাবে মেয়ের বিবাহে অযথা বিলম্ব হইতেছে। বেশ, আজ তিনি স্বামীকে মরণ পণ করিয়াই তাগাদা করিবেন, দেখা যাউক, তাহাতেই বা কি সুরাহা হয়।" বিধিলিপি বা কর্ম্মফল তখন অলক্ষ্যে থাকিয়া শাণিত কৃপাণের দীপ্তীর ন্যায় নিষ্ঠুর বক্র হাসি হাসিতেছিল।

১২

আফিস হইতে আসিয়া কাপড় জামা ছাড়িয়াই বসন্তবাবু ডাকিলেন "বুড়ি"। বুড়ি তামাক সাজিয়া কলিকা ধরাইয়া বাবার হাতে হুঁকা দিতেই বসন্ত বাবু মেয়ের দিকে চাহিয়া সচকিতে প্রশ্ন করিলেন, "অসুখ করেচে না কি রে, চোখ মুখ এতো শুক্নো কেন ?"

বুড়ি মাথা নাড়িয়া জানাইতে চাহিল যে তার কিছু হয় নাই, কিন্তু তার ব্যথা ম্লান দৃষ্টি সে অস্বীকারকে ছাপাইয়া গেল। বসন্তবাবু বুড়ির কপালে হাত দিয়া উষ্ণতা অনুভব করিতে গিয়া কহিলেন, "কই, গা তো গরম হয়নি, নতুন ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দিতে মাথা টাথা ধরেনি তো রে ? দিন কাল বড় খারাপ পড়েচে, একটু সাবধানে থাকিস্। চারিদিকে অসুখ বিসুখের ধূম লেগেচে

খুব, আমার মতন গরীবের ঘরে লাগলেই চক্ষু স্থির।"

সরোজিনী আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, "আইবুড়ো মেয়েদের আবার রোগ বালাই আছে। যমেও তাদের কাছে ঘেঁসে না। বলি হঁ্যাগা, সে দোজপক্ষে ছেলেটির বিয়ের যে ঠিক হয়েচে সে কি খুব পাকা কথা?" বিবাহের উল্লেখ মাত্র বুড়ি অন্তর্হিত হইল, বসন্ত বাবু মেয়ের দিকে চাহিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "মা হয়ে এমন নিষ্ঠুরের মতন নির্ঘাত কথা বলতে পার তুমি, ছেলে মানুষের কচি বুকে তা যে কত কঠিন হ'য়ে বাজতে পারে তা একবার ভেবে দেখ না, নিজেও তো একদিন মেয়ে ছিলে, সে কথা ভোলো কি করে?", সরোজিনী ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া মনের বেগ যথাশক্তি রুদ্ধ করিয়া ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "মেয়ে হ'য়ে জন্মেচি বলেই এ জন্মের প্রতি ধিক্কার জন্মে গেচে, যম যে সহজে এ হতভাগীদের কাছে এগুতে চায় না তা খুব জেনেচি,

এখন যা জিজ্ঞেস করছিলাম তার উত্তর দাও শুনি, সে ছেলের কি বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেচে?”

“গেচে বই কি। এখানে তো অনেকবার হাঁটা-হাঁটি করেও ভরসা পেলে না, তাদের খুব তাড়াতাড়ি এই মাসেই বিয়ে হওয়া চাই, কাজেই অন্য জায়গায় ঠিক করেচে। এই পঁচিশেই বিয়ে।”

“আমাদেরও কিছু তার চাইতে তাড়াতাড়ি কম না। এ মাসে বিয়ে না হ’লে পৌষমাস প’ড়ে যাচ্ছে, যেমন ক’রেই হোক্ এই মাসেই আমাদের মেয়ে পার করা চাই-ই——”

শেষের কথায় সরোজিনী এতো বেশী জোর দিলেন যে বসন্তবাবুও একটু চমকিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, “না জুটলে আর কি করচি বল, চেষ্টার তো ক্রুটী নেই দেখ্‌চ।”

“যেমন ক’রে হোক্ কাণা খোঁড়া যা হোক্ একটা জোটাতেই হ’বে, চেষ্টার অসাধ্য দুনিয়ায় কিছু নেই, আমার মেয়ের একটা পাত্তর তা আর জুটবে না?”

বসন্তবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কি বল্‌তে চাও চেষ্টা আর কিছু কম আছে? কাণা খোঁড়া ধরেই যদি মেয়ে দেবার মন, তা হ'লে তখন—'বুড়োবর' বলে ও সম্বন্ধতে নাক সেঁটকালে কেন। আমি তো পছন্দই করেছিলাম, নেহাৎ তোমার অমত দেখে পিছিয়ে গেলাম। ছেলেটিও হাতছাড়া হ'য়ে গেল, এখন আর ওপোর-পড়া হয়ে তো বল্‌তে পারি না যে সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে এসে আমার মেয়েকে বিয়ে করুক। কন্যাদায় সবারই সমান। যেখানে সম্বন্ধ পাকা ক'রে বিয়ের দিন পর্য্যন্ত ঠিক করে ফেলেচে, চোখের চামড়া থাকতে সেখানকার বিয়েতে ভাঙচি আমি প্রাণ থাক্‌তে দিতে পারি না। তা আমার মেয়ের কোনো কালে বিয়ে হোক্ আর নাই—হোক্।"

"আমার ঝকমারী তাই সে সম্বন্ধতে নাক সিটকেছিলাম, এখন তোমার পায়ে পড়ি যেমন সম্বন্ধ হোক্, এ মাসের মধ্যে এনে জুটিয়ে এ গলার ফাঁস খুলে দাও, নইলে আমি আফিম্ খেয়ে মরব

বলে রাখচি। লোকের বাক্য যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। এমন পোড়া মেয়ে পেটে ধরেছিলাম যে এতো লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে। আগে জানলে আঁতুড় ঘরেই যে নুণ খাইয়ে মারতাম।” সরোজিনীর চক্ষে জল আসিয়াছিল, তিনি আর দাঁড়াইলেন না, চলিয়া গেলেন। “তাই মারা উচিত ছিল, মেয়েটাও মরে বাঁচত।” বসন্তবাবুর এই উক্তি অবশ্য তাঁর কাণে গেল।

বসন্তবাবুর মেজাজ বিগড়াইয়া গেল, অতি প্রিয় তামাকু সেবনও তাঁহার আর ভাল লাগিল না। হুঁকা রাখিয়া দিয়া চুপ চাপ বসিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে রেণু আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “মা বল্‌লে, মুখ হাত ধুয়ে খেতে চল। আমিও তোমার সঙ্গে খাব বাবা!”—

বসন্তবাবু অসহিষ্ণু ভাবে কন্যার হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, “ছাই খাব আজ, পালা এখান থেকে।” বাবার মুখে এমন অপ্রিয় কথা রেণু কখনও শোনে নাই, অভিমানে তার ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া

উঠিল, তখনি সে চলিয়া গিয়া রান্নাঘরের দ্বারে পঁহুছাইয়া আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েচে রে রেণু, কে মারলে ষণ্টি না—অমর?" রেণুর কাছ হইতে কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না, এদিকে রেণুকে কঠিন কথা শুনাইয়া গম্ভীর মুখে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া বসন্তবাবুর স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। তিনি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, গামছা লইয়া কলতলায় গিয়া মুখ হাত ধুইতে ধুইতে কহিলেন, "রেণু, খাবার দিতে বল্‌রে।" রেণু এক পাও নড়িল না। রেণুর প্রতি আদেশ সরোজিনীর কাণে পঁহুছিবা মাত্র তিনি তাড়াতাড়ি খাবার গুছাইয়া লইয়া দিতে আসিলেন। রেণুকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আঁচলে চোখ মুছিতে দেখিয়া বসন্তবাবু তাহার হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "রেণুর খাবার আন গো। বুড়ি, বুড়ি কোথা রে?"

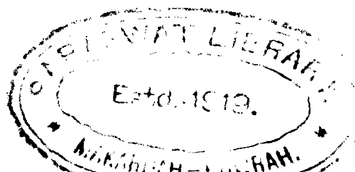
বুড়ির সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। গৃহিণী মালা জপ করিতেছিলেন, ছেলের আহারের স্থানে আসিয়া কহিলেন, "বুড়ি শুয়ে রয়েচে যে, বলি বসন্ত, মেয়ে বাছা আর ঘরে রাখা যায় না। একটা কিছু ব্যবস্থা কর্, চোদ্দ পুরুষকে নরকে ফেলবার জোগাড় আর করিস্ না।"

বসন্তবাবু যদি বা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, মার কথা শুনিয়া আবার তাঁহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "ব্যবস্থা আমি কি মাথা মুণ্ডু কর্‌ব তাই শুনি, একবার তুমি খোঁচা দিচ্ছ, একবার তোমার বউ খোঁচা দিচ্ছে। কেন রে বাপু, আমি কি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে আছি ? না হয় আমার মরণ, না হয় মেয়েটার মরণ, সব ল্যাটা চুকে যায় তাহ'লে।"

গৃহিণী ছেলেকে রাগিয়া উঠিতে দেখিয়া গলার স্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অতো চটে উঠিস্ কেন বাছা, মেয়ের বিয়ে সংসারে সবাকেই দিতে হয়, না দিলে জাত যাবার

ভয়, চোদ্দ পুরুষের নরকে পচে মরবার ভয় সবাই-ই রেখে থাকে, এতে মানুষ এত অধৈর্য্য হ'য়ে পড়লে সংসার উল্টে যেত। তোর যেমন ক্ষমতা, তেমনি পাত্তর খুঁজে মেয়ের বিয়ে দে। বরাতে থাকে কুঁড়ে ঘরে গিয়ে তোর মেয়ে সুখ-ভোগ করবে, না থাকে রাজরাণী হ'য়ে চোখের জলে ভাসবে। এ মাসের দিনও দেখতে দেখতে কেটে চল্‌ল। সামনেই পৌষমাস, এতো বড় মেয়ে আর ঘরে রাখা যায় না, চেষ্টা বেষ্টা করে এই মাসেই যাতে মেয়ে পার হয় তার জোগাড় কর্, যতক্ষণ বেঁচে আছি, ভাল পরামর্শ দিতে আসচি, মরে গেলে আর কোন কথা কইতে আস্‌ব না।"

বসন্তবাবু উত্তর দিলেন না, নীরবে আহার সম্পন্ন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।



১৩

রাত্রে মার ডাকাডাকিতেও বুড়ি সেদিন আহার করিতে উঠিল না, মাথা ব্যথা করিতেছে বলিয়া বিছানায় চুপ চাপ পড়িয়া রহিল। ছেলে মেয়ের শরীর অসুস্থ হইলে বসন্তবাবু নিজে গিয়া তখনই তদারক করেন, সে দিন কিন্তু মন তাঁর বড় ভার হইয়াছিল, সুতরাং বুড়িকে আর দেখিতে আসিলেন না। অভিমানিনী বুড়ির প্রাণে তা বড় বাজিল, বাড়ীর সকলেই যথা সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল, তার চক্ষে কিন্তু ঘুম আসিল না, কেন সে মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছিল, তাই যদি বা মেয়ে হইল, কেন দরিদ্র বাপমার গলগ্রহ হইয়া জন্মিল, যদি বা জন্মিল, কেন সে মরিল না? তাহা হইলে তো তার জন্য আর সকলকে এ নিগ্রহ ভোগ সহ্য করিতে হইত না। সত্যই কি মরণ তাকে এড়াইয়া চলিতে চায়? তাই কি সম্ভব? জগতে জন্মের পর মৃত্যু

আছেই, সে ও কিছু চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে না। একদিন নিশ্চয় তাকে মরিতে হইবে, কিন্তু এই সময় মরিতে পারিলে কত ভাল হইত। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সম্ভব ? ঐ যে কে একটি মেয়ে কেরোসিন জ্বালিয়া সেই আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে—তার মতন করিলে হয় বটে। কিন্তু না, আত্মহত্যা মহাপাপ, তা ছাড়া, জীয়ন্ত মানুষ আগুনে পুড়িয়া মরা,—সে কি কষ্ট! তার চাইতে বিষ খাওয়া ভাল, কিন্তু তাইবা কেমন করিয়া সংগ্রহ করা যায়। ঠাকুরমা আফিং খান বটে, কিন্তু কতটুকু খাইলে মানুষ মরে, তা কে জানে ? খাইয়া যদি মৃত্যু না হইল, অথচ লোক জানা-জানি হইয়া পড়িল, তাহা হইলে তো বিষম কেলেঙ্কারী। না, না, সে হইবে না, আচ্ছা, এখনকার দিনে অলৌকিক ঘটনা কি একেবারেই অসম্ভব ? তার দুঃখ দেখিয়া যদি কোনো দেব দেবী তার ঘুমন্ত আত্মাকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইয়া আকাশ পথে চলিয়া যায়!

সকালে উঠিয়া বাবা, মা, ঠাকুরমা সবাই দেখে, বুড়ি ঘুমাইয়া আছে। অথচ তার দেহে প্রাণ নাই, সে কি মজা! হত তো সবাই তখন তার জন্য কাঁদিবে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে, দিনকতক তার অভাব খুব বেশী বোধ হইলেও তাকে ভুলিয়া যাইতে সময়ও বড় লাগিবে না। দিন আর রাত্রি আবার সেই সমান ভাবে এ বাড়ীতে যাওয়া আসা করিবে। আবার সবাই হাসিয়া গল্প করিবে! ভাই বোনরা যারা এখন 'দিদি' অন্ত প্রাণ, তার কথা আর উল্লেখও করিবে না! যে বুড়িকে বাবা উঠিতে বসিতে তাঁর প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে দিনে পঞ্চাশবার স্মরণ করেন, বুড়ির জন্য তাঁরও কোন কাজ আটক থাকিবে না। কেবল বুড়ির সাধের পোষা টিয়াপাখীটা দিনে শতবার 'বুড়ি বুড়ি' করিয়া ডাকিয়া উঠিত, কেন না, এ তার সাধা বুলি। সে অবোধ পাখী তো বুঝিবে না, বুড়ি বাঁচিয়া নাই, সুতরাং তার সাধা বুলি উচ্চারণের অভ্যাস সে কিছুতেই ভুলিতে

পারিবে না। পৃথিবীর গৃহে যখন এই ব্যাপার চলিবে বুড়ি তখন কোথায়? তার অস্তিত্ব কি কোথাও থাকিবে না? থাকিবে বই কি, দেবতারা তাহাকে তারা করিয়া আকাশে রাখিয়া দিবেন। ঐ যে একটা তারা খুব জল জল করিয়া জ্বলিতেছে উহারই পাশে সে প্রতি রাত্রে ফুটিয়া উঠিবে। তার বাপ, মা, ভাই, বোন কেহ তাহাকে চিনিবে না, কিন্তু সে তার এই চৌদ্দ বৎসরের, খেলাধূলার ঘরখানির সব লোক, সব জিনিষকেই চিনিবে, প্রতি রাত্রে যথাস্থানে উঠিয়া ইহাদের দৈনন্দিন জীবন কাহিনী জানিয়া লইবে। যে বুড়িকে এখন সব কাজে সব সময়ে সকলেরই প্রয়োজন, সেই বুড়ি অভাবেও তাহাদের দিনগুলি কেমন কাটিতে থাকিবে, তাও তার দৃষ্টি এড়াইবে না—কিন্তু, কিন্তু,—আর তো ভাবা চলে না, বুড়ির দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিল, বুড়ি চলিয়া গেলে সবারি যদি মুক্তিলাভ ঘটে, তবে বুড়ির কেন এ অশ্রু, কেন এ উদ্দাম তা বুড়ির অবোধ মন বোঝে কই?

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, জানালার পথে যে তারাগুলিকে দেখা যাইতেছিল, উহারা সরিয়া যাইতে অন্য কতকগুলি সেথায় উঁকি দিয়া চাহিল, বাতাস বেশ শীতল হইয়া উঠিল, বুড়ির বড় সাধের শিউলী গাছ হইতে আধফোটা ফুলগুলির সুগন্ধ সে বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বুড়ির অশ্রু থামিল না, নিঃশব্দে উহা ঝরিয়া পড়িয়া বুড়ির তপ্ত উপাধান ভিজাইয়া তুলিল, বুড়ির কাছেই অন্য শয্যায় অমল ঘুমাইতেছিল, মাঝখানের দরোজা দিয়া পাশের ঘরে ঠাকুরমা ঘুমাইতেছিল দেখা যাইতেছে, সকলেই নিশ্চিন্তমনে নিদ্রার আরামস্পর্শে সুখসুপ্ত, কেবল আপনার মনে বুড়িই আপনি কাঁদিয়া আকুল। তার এ নীরব বুক ফাটা কান্নার বুঝি সাক্ষী নাই; মহা প্রকৃতিই একমাত্র তার সাক্ষী। কিন্তু সে যে চির নির্ব্বাক্, চির মূক। আর বুঝি সাক্ষী সমাজের অন্তর্য্যামী দেবতা। কিন্তু সেও জড়স্পর্শী পাষাণ দেবতা, কোথায় আজ সেই মহান্ শাক্ত সাধক, যে তার তপস্যার বলে ঐ

পাষাণের মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়া জড়কে সঞ্জীব প্রাণের হিল্লোলে আন্দোলিত করিয়া তুলিবে ?

১৪

"বসন্ত, বসন্ত" কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। নিখিলেশ খোলা দরোজার কড়াই বারবার সজোরে নাড়া দিয়া গৃহবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আবার ডাক দিলেন, "বসন্ত, বাড়ী আছে হে। রেণু, অ—রেণু" এবারে রেণু মল ঝুম ঝুম করিয়া বাহিরে আসিল। নিখিলেশকে দেখিয়া কহিল, "কাকাবাবু।"

"হ্যাঁ বেটি, কাকাবাবুই বটে, চিন্‌তে পেরেছিস একমাস পরে দেখে ? বাবা কোথা, বাড়ী আছেন ?"

"আছেন" "কি করচেন, নাকে তেল দিয়ে

ঘুমুচ্ছেন না কি, এত ডাকে সাড়া দিচ্ছেন কেন, ডাক্ শীগ্‌গীর।"

"বাবা তো শুয়ে আছেন বাবার জ্বর হয়েছে যে।"

"এতোক্ষণ তাই বল্‌তে হয় পাগ্‌লী মেয়ে। ধর, এই পুঁটুলীটা, দুটো ফুলকপি, কড়াইশুঁটি আর গল্‌দা চিংড়ী আছে কতকগুলো। মাকে দিগে যা, আর বল্, কাকাবাবু এসেছেন, বাবাকে দেখতে চাইছেন।"

রেণু অবিলম্বে জিনিষগুলি মার কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া নিখিলেশকে পিতার কাছে ডাকিয়া লইয়া গেল, বুড়ি বাবার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, ঘরে একটি প্রদীপের আলোক মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে, নিখিলেশ নিজেই সেটিকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বসন্তবাবুর কাছে গিয়া বসিলেন, বসন্তবাবু কহিলেন, "নিখিলেশ যে, দেখ্‌ছ কি ভাই জ্বরে পড়েচি, তুমি হঠাৎ সেদিন দেখা দিয়ে আবার কোথায় যে উধাও হয়ে

গেলে আর তার উদ্দেশ পেলাম না, ঠিকানাটা দিয়েছিলে বটে, কিন্তু নিজের মাথার ঘায়ে নিজেই পাগল, খবরও নিয়ে উঠ্‌তে পারি নি।”

নিখিলেশ কহিলেন, “হঠাৎ আমায় কাজের গতিকে মফঃস্বলে চলে যেতে হয়েছিল, তাতেই আর আস্‌তে পারি নি, তারপর নূতন খবর আর কিছু আছে, জ্বরে পড়েচ এ একটা টাটকা নতূন খবর বটে, তা ছাড়া আর কিছু?”

“আছে বটে, মেয়ের বিয়ের সব ঠিক্ ঠাক্ এই ২৯শেই দিন ঠিক হয়েছে, আর দিন নেই, পরেই পৌষমাস, কিন্তু হঠাৎ আমি রোগে পড়লাম, যদি না সেরে উঠ্‌তে পারি, সে এক বিষম বিপদ, মাঝে এক সপ্তাহ মাত্র সময়, কোনো চুলোয় কেউ নেই যে এসে কর্ত্তা হ’য়ে দাঁড়িয়ে সব করে কম্মে দেবে।”

“বেশী কিছু না, সর্দ্দি জ্বরই বোধ হয়, সেরে যাবে বই কি, ভয় কিসের? নেহাৎ না সারে, ঠিক্ করে রাখ, মাঘ মাসের প্রথমেই হ’বে।”

সভয়ে বসন্তবাবু বলিয়া উঠিলেন—

"অমন কথা বোলো না ভাই, যেমন করে হোক্ এই মাসেই হওয়া চাই, আর দেরী করা অসম্ভব।"

"বেশ বেশ, তাই হবে, পাত্র কি করে, কি দেনা পাওনা ঠিক হ'লো?"

"বেশ সস্তাতেই হয়েচে, হাজার খানেক দিলেই হবে, পাঁচশ টাকা এ দিককার খরচ, সেটা বাড়ী বাঁধা দিয়ে জোগাড় করব, গিন্নীর গয়না যা কিছু ছিল, সেই সব নিয়ে হাজার টাকারও জোগাড় হয়েচে, ছেলে তিরিশ টাকার কেরাণী, বাপ নেই, মা আছে, একটা পাশও করেচে।"

"পাশের কথা চুলোয় যাক্, স্বভাব চরিত্র কেমন, অবস্থা সচ্ছল তো, ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীর আবার বিয়ের সখ, ঐ টাকায় নিজের পেট, মায়ের পেট চালাবেন না স্ত্রীর ভরণ পোষণ করবেন?"

"তা বলে কি ত্রিশ টাকার কেরাণীরা বিয়ে

করবে না বল্‌তে চাও? ঘরে কিছু নেই, দেশে ঘরবাড়ী আছে বটে, তবে সে না থাকারি মধ্যে, এখানে চাঁপাতলার একটা মেসে ছেলে থাকে। আমি দেখে এসেছি, পুরুষ মানুষের রূপের কথা তোলাই উচিত না। সে কথা যাক্, স্বভাব চরিত্র, তা ছেলের একটু বয়সও হয়েছে, তার ওপর মেসে রয়েছে, একটু এদিক সেদিক আছে বই কি, সে ধরতে গেলে চলে না।"

নিখিলেশ বুড়ির মুখের দিকে চাহিয়া চকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"ওহ হো, কথা কইতে গেলে কিছুরই ঠিক রাখতে পারি না, বুড়ি মা, তুমি যাও এখান থেকে, দুটো পান সেজে আন গে।"

বুড়ি উঠিবার জন্য উস্ খুস্ই করিতেছিল, কিন্তু বাবার মাথা টেপা ছাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া পলাইতেও পারিতেছিল না। এখন আদেশ পাইয়া পলাইয়া বাঁচিল। পান পাঠাইয়া দিল ঘণ্টির হাতে। নিখিলেশ কহিলেন—"দেড়হাজার টাকা দাম দিয়ে খুব ভাল

পাত্র কিন্‌ছ তো, এ যে দেখছি সস্তায় একেবারে কিস্তীমাৎ।”

বসন্তবাবু নীরবে কপালে হাত ঠেকাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

নিখিলেশ উষ্ণভাবে কহিলেন, “দেখ, ও সব ভিট্‌কিলিমী আমার কাছে ক’রো না, বরাত দেখাও কি, বরাত তো তোমার নিজের হাতের গড়া, নিজের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা ভুগেও আবার সেই নিঃসম্বল অবস্থার লোকের হাতে মেয়ে তুলে দিতে যাচ্ছ? দশবচ্ছর বাদে তারও যে আবার তোমার দশা হবে তা ভাব্‌ছ না;”

“সব ভেবেচি ভাই, কিন্তু উপায় নেই। তা ছাড়া হিন্দুর ছেলে হয়ে অদৃষ্টকে মান্‌তে হয় বই কি, মেয়ের অদৃষ্টে, সুখ থাকে, ওরই হাতে মেয়ে আমার সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দেবে।”

শ্লেষভরে নিখিলেশ কহিলেন, “পুরুষবাচ্ছা বটে, ছ’বছর থেকে সুরু করে কেন যে ষোলটা

বচ্ছর স্কুল কলেজে মাথা ঘামিয়ে পড়া শুনা করেছিলে তা জানি না। বিদ্যাপীঠের হোমের আগুনে মগজের যত ঘি সব নিঃশেষ ক'রে জ্বালিয়ে এখন তাতে শুধু গোবর ভরে নিয়েচ, গোবর বলাও ঠিক না, সেও তো সারের কাজ করে, ছাইমাটিও না, তাদেরও উর্ব্বর শক্তি যথেষ্ট। তবে হঁ্যা, কাঁকর ভরা বটে, নিজেদের হাতে নিজেদের জীবনের স্থতো গুলোয় ইচ্ছে করে জট্ পাকিয়ে তুল্‌বে, আর খুলবে এসে তোমার অদৃষ্ট দেবতা, হায় রে বুদ্ধি!"

বসন্তবাবু কোনো উত্তর দিলেন না, গৃহে গভীর স্তব্ধভাব বিরাজ করিতে লাগিল, ডিবা হইতে গোটাদুই পান তুলিয়া লইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া আপনার মনে চিবাইয়া চিবাইয়া নিখিলেশ কহিলেন, "শোনো বসন্ত, পাগলামী বুদ্ধি ছেড়ে দাও, এ পাত্রে মেয়ে দিও না, একটি ভাল পাত্রকে পেয়েছিলে বলেছিলে, মেয়ে সে নিজে পছন্দ করে গেছে তার কি হ'লো?"

বসন্তবাবু নিঃশব্দে ডান হাতখানি তুলিয়া পাঁচটি আঙুল মেলিয়া দেখাইলেন, নিখিলেশ কহিলেন, "পাঁচহাজার চায়? ছোক্‌রা না ছোক্‌রার বাপ্? বাপ্‌ই হবেন, তা ছোক্‌রা যে দেখে নিজে পছন্দ ক'রে গেল, তার বুঝি কোনো মূল্য নেই?"

"ওহে, এই সব ছোকরারা আবার প্রেমের কবিতা লেখে, ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার, যাক গে, ও মেয়েমুখো ছেলেদের হাতে মেয়ে দিয়েও কাজ নেই। এতো তোমার কিসের তাড়া, ভালছেলে না পেলে মেয়ের বিয়ে নাই বা দিলে এখন?"

বিরক্তভাবে বসন্তবাবু কহিলেন, "গায়ের জোরের কথা তুমি কি বল নিখিলেশ, হ'তে আজ মেয়ের বাপ তো বুঝতে, চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হ'তে চলেচে এখন কিনা কুপাত্রে সুপাত্রের চিন্তা।"

"চুলোয় যাক্ চোদ্দপুরুষ, কথায় কথায় যারা নরকে পড়বার ভয় রাখে, তাদের অনন্তকাল নরকে পড়েই পচে মরা ভাল। "হ'তে আজ মেয়ের

বাপ” ব’লে শাসাচ্ছ কি, তা যদি হ’তাম, তোমার মতন বাবা হয়ে কসাইএর কাজ করতাম না, এ আমি জোর গলায় বল্‌চি,——

নিখিলেশ চুপ করিয়া গেলেন, বসন্তবাবুও আর উচ্চবাচ্য করিলেন না, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। তখন নিখিলেশ আবার মুখ খুলিলেন, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, “রোগা মানুষ তুমি, বেশী বকাতে চাই না, তবে আমার পরামর্শ শোনো। এ সম্বন্ধ উপস্থিত ভেঙে দাও, কাল থেকে আমিও পাত্রের চেষ্টা দেখ্‌ছি, তুমিও দেখ। টাকার জন্যে ভেবো না, আমি টাকার ভার নিলাম, বুঝলে?”

বসন্তবাবু বিচলিত ভাবে কহিলেন, “আর হয় না নিখিলেশ, সব ঠিকঠাক, এখন সম্বন্ধ ভাঙলে সবাই ছোটলোক বলবে। তা ছাড়া সময় সংক্ষেপ, এর মধ্যে পাত্র যদি না পাওয়া যায়, পৌষমাস পড়ে যাবে। যেমন করে হোক্‌, এ মাসে মেয়ের বিয়ে আমি দেবই। তোমার হাতে ধরি, বাধা দিয়ো না ভাই—!”

নিখিলেশ উত্তর দিলেন না, গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন একটুপরে অমল আসিল, তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা ছিলে অমল, তোমার বাবার অসুখ, রাত্রে কোথা গিয়েছিলে ?"

অমল কহিল, "পাশের বাড়ীতে পড়া জেনে আসি কিনা, তাই গেছ্‌লাম, আর ডাক্তারখানা থেকে বাবার জন্যে ওষুধও আন্‌লাম।"

"বেশ করেচ, পড়াশুনা কেমন হ'চ্ছে ? শুধু গিলে খেয়ো না বাবা, একটু চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ো, হজম হ'বে।" অমল উহার অর্থ না বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। জ্বর কবে হইতে হইয়াছে জানিয়া, প্রেসক্রপসন্‌খানা দেখিয়া নিখিলেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আজ আসি বসন্ত, রাত হয়ে যাচ্ছে, কাল পারি তো আস্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।"

নিখিলেশ চলিয়া যাইতেই অমল শশব্যস্তে মার কাছে গিয়া কহিল, "মা, মা, একটা মজার

কথা আছে।" বুড়ি রুটি বেলিয়া দিতেছিল, সরোজিনী সেঁকিয়া তুলিতেছিলেন, সরোজিনী ছেলের মজার কথা শুনিবার জন্য সাগ্রহে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। অমল কহিল, "সুধাকান্ত বাবুর সঙ্গে এক্ষুণি রাস্তায় দেখা হয়েছিল, বুড়ির বিয়ের ঠিক হ'য়েচে শুনে বল্লেন, ও বিয়ে ভেঙে দিয়ে পৌষমাসটা তোমরা সবুর করলে ভাল হয়। এতো তাড়াতাড়িতে মাকে আমি কিছু বলে উঠ্‌তে পারি নি, একমাস সময় পেলে ব'লে ক'য়ে সব ঠিক করতে পারি। আমি বল্লাম, মাকে গিয়ে বলব, বাবার অসুখ শুনে দেখ্‌তে আসবেন বলেচেন।"

সরোজিনী নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজের কাজে মন দিলেন, অমল সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "সুধাকান্ত বাবুর সঙ্গে হ'লেই ভাল হয় মা। ওঁদের মটরগাড়ী আছে। কলেজে রোজ মটরে ক'রে আসেন, মস্ত বড় বাড়ী"—

মা বাধা দিয়া কহিলেন, "ওঁর কাছে বস্‌গে

যা। বুড়ির মস্ত কপাল তাই মস্ত বাড়ীতে গিয়ে পড়বে, মেয়ের কপাল কেমন!" মাতার কথার ঝাঁজ শুনিয়া অমলের উৎসাহ দমিয়া গেল, সে আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না।

১৫

সন্ধ্যা দীপ জ্বালিয়া, শাঁখ বাজাইয়া বুড়ি গিয়া পিতার পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে লাগিল, আজ পাঁচদিন হইল বসন্তবাবু জ্বরে পড়িয়াছেন, শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া উঠিবার জন্য অবস্থার অতিরিক্ত হইলেও, প্রথমদিন হইতেই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্বরের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথাও খুব। তবে এ চারদিনের মধ্যে জ্বরের বৃদ্ধিও হয় নাই। একশত দুই ডিগ্রীতেই স্থির হইয়া আছে। নিখিলেশ জ্বরের দ্বিতীয় দিনে আসিয়াছিলেন, পরদিন আসিবেন বলিয়াছিলেন বটে কিন্তু আসেন নাই।

বসন্তবাবুর এখন বিশেষ ভাবনা কি করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিবেন, বুড়ি পা টিপিয়া দিতে দিতে কহিল, "হ্যাঁ বাবা, তোমার গার ব্যাথা কি একটুও কমে নি ?"

বসন্তবাবু কহিলেন "না মা।"

এই সময় অমল আসিয়া একখানা চিঠি দেখাইয়া কহিল, "তোমার আপিসের চাপরাশী দিয়ে গেল বাবা।"

বসন্তবাবু উৎসুক ভাবে হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি লইয়া কহিলেন, "বুড়ি, প্রদীপটা একটু মাথার কাছে আন্‌ত মা, চিঠিখানা পড়ে নি। অমল, তুমি সকাল সকাল পড়া সেরে এসো বাবা, আর ডাক্তারবাবুকে আমার খবর দিয়ে এসো, জ্বরং সমানই আছে ব'লো, শিশিটা না হয় নিয়ে যাও, অষুধ যদি বদ্‌লেই দেন।"

অমল 'আচ্ছা' বলিয়া শিশি লইয়া চলিয়া গেল, গৃহিণী আহ্নিক সারিয়া ঘরে ঢুকিলেন, ছেলের মাথায় তাঁর হরিনামের ঝুলিটি ঠেকাইয়া মনে মনে

কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে বসন্তবাবুর রোগ শুষ্ক ললাটে দুশ্চিন্তার ম্লান ছায়া ঘনাইয়া আসিল, সেদিন নিখিলেশের কথা শুনিয়া তাঁর মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, সেজন্য তাঁহার অফিসের সহযোগী বন্ধু অতুলবাবুকে লিখিয়াছিলেন, নির্দ্দিষ্ট পাত্রটির স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে একটু বিশেষ রকম খোঁজ লইতে। পাত্রটির সম্বন্ধে অন্যান্য সন্ধানও সেই বন্ধুটীই দিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকেই খোঁজ লইয়া জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, উত্তরে তিনি লিখিতেছেন—

খোঁজ করিয়া বিশেষ কিছু পাইলাম না, যাহা আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি, বোধ হয় তাহাই সঠিক সংবাদ। অর্থাৎ বয়স দোষ স্বভাবে কিছু ধরিয়াছে, তবে ভরসা এই যে অমন বয়সে প্রায় মেসবাসী অনেক যুবকেরই মতি গতি একটু বিগড়াইয়া থাকে। বয়স্থা কন্যার সহিত বিবাহ হইলে সহজেই সে ত্রুটি সারিয়া যায়, অবশ্য কারও কারও সারে

না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বিশেষ আশঙ্কার কথা বটে, কিন্তু ভালর দিকটাই আশা করা উচিত। তুমি মেয়ের বিবাহের জন্য বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ, নহিলে বলিতাম এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়ে দেওয়াই ভাল, যেহেতু জানিয়া শুনিয়া মনের মধ্যে ধোঁকা লইয়া এ পাত্রে কন্যা না দিলেই ভাল হইত। আমি আর কি বলিব, তোমার বিষয় তুমিই ভাল রকম বিবেচনা করিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য নিৰ্দ্ধারণ করিয়া লও।"

ভাবী জামাতার সম্বন্ধে ইহা শুনিয়া কোন্ স্নেহশীল পিতার হৃদয় না দুশ্চিন্তায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে? বসন্ত বাবু চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অপ্রসন্ন মুখে বলিয়া উঠিলেন, "বুড়ি, শীগ্গির আলো সরা, চোখ জ্বলে গেল।"

চিঠিতে কি লেখা ছিল তাহা না জানিলেও বুড়ি বুঝিতে পারিল নিশ্চয়ই কোনো অপ্রিয় সংবাদ এ পত্র বহন করিয়া আনিয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে প্রদীপ সরাইয়া লইয়া আবার গিয়া বাবার

গায়ে হাত বুলাইতে বসিল, বসন্ত বাবু "ওঃ আঃ" কাতরোক্তি করিয়া নিজের কপাল টিপিয়া ধরিলেন। বুড়ি তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "বাবা, তোমার মাথা ব্যথা করচে বুঝি, তবে মাথাতেই এখন হাত বুলিয়ে দিই" ত্রস্তে উঠিয়া বুড়ি বাবার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল, বসন্ত বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বুড়ির হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন, "কিচ্ছু আরাম হচ্ছে না, তুই যা এখান থেকে বুড়ি, আমি মলাম।"

বুড়ি সে আদেশ মানিতে পারিল না, নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, আবার ধীরে ধীরে পিতার মাথায় হাত বুলাইতে সুরু করিয়া মমতা-ভরা কণ্ঠে কহিল, "বড্ড কষ্ট হচ্ছে বাবা? ডাক্তারকে খবর দিই?"

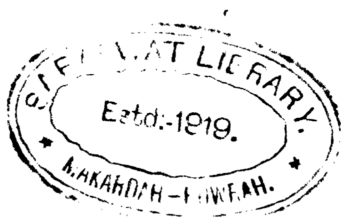
অসহ্য ভাবে বসন্ত বাবু বলিয়া উঠিলেন, "না, না, কাউকে খবর দিতে হবে না বুড়ি, একলা একলাই বেশ আছি!"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল, সহসা বসন্তবাবু

আর্ত্তকণ্ঠে কহিলেন, "বুড়ি, আজ যদি মরে যাই তো বেশ হয় রে" বুড়ি প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল "অমন কথা কেন বলচ বাবা, আমরা তা হ'লে কোথায় দাঁড়াব ?"

"চুলোয়" বলিয়া বসন্ত বাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর হঠাৎ বুক ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই যদি এ সময় মরতিস্ বুড়ি, তোর মা একদিন বলেছিল ব'লে আমার তখন রাগ হয়েছিল, আজ মনে হচ্ছে, সত্যিই যদি মরতিস্, এই আমার চোখের ওপর তোর মরণ দেখ্‌তাম, নিজের হাতে তোকে শ্মশানে চিতা শয্যায় শুইয়ে সব শেষ করে এসে নিশ্চিন্ত হতাম। তোর ভাবনা আমার এ জন্মের শোধ শেষ হয়ে যেতো।" থামিয়া থামিয়া এক টানে এতো গুলি কথা বলিয়া বসন্তবাবু শ্রান্তভাবে চুপ করিলেন, দুই ফোঁটা অশ্রু তাঁর দুই চক্ষু বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল, স্তব্ধ ক্ষুদ্র গৃহে তাঁর সেই বুক ভাঙা আর্ত্তস্বর প্রেতের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যেন

এক ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। নিশ্চল প্রস্তর প্রতিমার মত বুড়ি পিতার শিয়রে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, অজ্ঞাতে কখন যে তার সেবারত হাত দুটি পিতার ললাট হইতে সরিয়া আসিয়া তাহারই কোলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে সে জ্ঞানও থাকিল না, উদ্গত প্রায় অশ্রুবিন্দু পিতার আর্তকণ্ঠস্বর শুনিয়া চক্ষেই জমিয়া গিয়াছিল। অকম্পিত দেহের মধ্যে শোণিত কণার মাঝে পিতার কঠোর কথা গুলার অশরীরী প্রেতমূর্তি যেন তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছিল। সে নৃত্যের তালে তার নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।



১৬

রাত্রে বসন্তবাবুর মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে তিনি থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। গৃহিণী বাতগ্রস্ত দেহ লইয়া আর ঠাণ্ডায় নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া ছেলেকে দেখিতে যাইতে পারিলেন না, সম্মুখের বারান্দায় চুপ চাপ বুড়িকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া শুইয়া শুইয়াই ডাকিলেন, "বুড়ি, অ বুড়ি, তোর বাবা যে বড্ড কাৎরাচ্ছে রে, জ্বর বাড়ল না কি ?"

বুড়ি কোনো উত্তর দিল না, ঠাকুরমা রাগিয়া কহিলেন, "কাণে কালা হয়েছিস্ না কি লা, মুখে রা নেই কেন ?" এবারেও কোন সাড়া শব্দ নাই, গৃহিণীর স্বর তখন আর এক পর্দ্দায় উঠিল "ভালো মেয়ে যা হোক্, দেমাকে যেন ফেটে মরচিস্, এমন তো পয়মন্ত মেয়ে যে হাজার খুঁজে খুঁজে বরই মেলা দায়, অতি কষ্টে কেষ্ট বিষ্ণু গোচ যাও

বা মিল্‌ল, তা বাপ রোগে পড়ল, এখন কেই বা বিয়ের জোগাড় করে, আর কেই বা রোগ সামলায়। আমরাও মেয়ে ছিলাম বাপু, এমন ক'রে বাপ মাকে চোখের জলে নাকের জলে চুবিয়ে মারিনি।" অমল সেই মাত্র আসিয়া বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছে। সে কহিল, "হাঁ ঠাকুরমা তা বুড়ির দোষ কি, ও কি ইচ্ছে করে তোমাদের সবাইকে নাকের জলে, চোখের জলে চুবিয়ে মারচে? ওকে অতো বকা কেন, ও তার কি জানে?"

নাতির এ ওকালতীতে ঠাকুরমা মোটেই প্রসন্ন হইলেন না, ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন, "তুই চুপ্ করে থাক্ অমল, আপনার আপনার ভাগ্যি সবাই নিয়ে আসে, তা কেউ কা'র গড়ে দেয় না। যার যেমন কপাল তার তেমন আয় পয়, আমি শুধু তাই বল্‌চি।"

অমল আর উচ্চ বাচ্য করিল না, বুড়িও সেখান হইতে সরিয়া আস্তে আস্তে ছাদে গিয়া উঠিল,

শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ ঝক ঝকে রূপার পালিস করা কাস্তের ন্যায় আকাশে তখনও জ্বলিতেছে। কলিকাতার বাষ্প ধূমাচ্ছন্ন আকাশ ধোঁয়াটে হইলেও তার পাতলা আবরণের মধ্য দিয়া নীল রঙ বড় সুন্দর দেখাইতেছে। বুড়ি ছাদের এক পাশে বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এই এতোবড় কলিকাতা সহরে, এতো অগণ্য বাড়ী, অগণ্য জনসমুদ্র, সে যদি নিশীথ রাত্রে চুপি চুপি বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়া এই জনসমুদ্রের মাঝে ডুব দেয় কে তার সন্ধান জানিবে? মরণ তো নেহাৎ হাতের জিনিষ নয় যে চাহিলেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহার আত্মগোপনটাই এখন বিশেষ প্রয়োজন। রাত্রি পোহাইবামাত্র তার মুখ যেন এ বাড়ীর আর কারও চোখে না পড়ে, তার দায় হইতে চাই এখন সকলেরই নিষ্কৃতি। এ নিষ্কৃতি সে আজই সকলকে দিবে, দিবে দিবে! কিন্তু কেমন করিয়া, সত্যই কি এই কলিকাতা নগরীর বিশাল জনসমুদ্রে ডুব মারিয়া? সেটা কি বিশেষ সহজ?

কেনই বা নয়, সে কারও বাড়ীর দাসী হইয়া খাটিয়া খাইবে, কেই বা তাকে চিনে, কেই বা তাকে জানে? পিতৃমাতৃহীন গরীব মেয়ে বলিয়া সে নিজেকে সকলের কাছে পরিচিত করিবে, লোকে কি তাহা বিশ্বাস করিবে না? কিন্তু কেমন করিয়া লোকের বাড়ী গিয়া কাজকর্ম্মের প্রার্থনা করিতে হয় তাহাও তো সে জানে না। রাত্রির অন্ধকারে সে না হয় পথে বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু প্রভাতে যখন এই সহরের বুক হইতে অন্ধকারের যবনিকা সরিয়া যাইয়া আলোকের রেখা ফুটিয়া উঠিবে, তখন সেই প্রদীপ্ত দিবালোকের তীব্র দৃষ্টিতে সে যে নিতান্তই মুসড়াইয়া যাইবে। আর একটা কথা, এখনি হয় তো পথের মধ্যেই পাহারাওয়ালা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে, তাহার সহস্র সন্দিগ্ধ প্রশ্নের উত্তর দিবার সামর্থ্যে তার কুলাইবে কি—কখনই না। তা ছাড়া আর একটা কথা তো তার মনেই ছিল না, তার বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই পাড়া প্রতিবাসী

তার নামে কুৎসা রটনা করিয়া তাদের সমস্ত পরিবারের মুখে কলঙ্ক কালী লেপিয়া দিবে—না, না, এ কাজ তবে কখনই সে করিবে না। যেমন করিয়া হোক্ মরণকেই সে আজ বরণ করিবে। ঐ ভিন্ন দ্বিতীয় পথ তার সম্মুখে আর খোলা নাই।

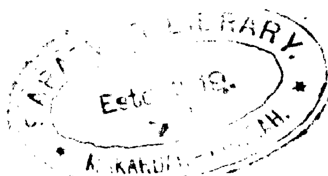
ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, ক্ষীণ আয়ু চাঁদের জ্যোতিঃ নিভিয়া গেল। পাহারাওয়ালারা হাঁক দিয়া চুপ করিল। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার শব্দ ও লোক কোলাহল অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিল। বসন্ত বাবুও এতোক্ষণ যন্ত্রণার অবসানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই আর তাঁর আর্ত্তস্বর শোনা যাইতেছিল না। বুড়ি ভাবিল, এই তো উপযুক্ত সময়, আর দেরী করা মোটেই উচিত না। নিঃশব্দে সে তখন নীচে নামিয়া আসিয়া যেখানে তার পোষা পাখীটি চোখ বুজিয়া বিশ্রাম করিতেছিল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, একবার তার দিকে চাহিয়া সে দেশলাই ও কেরোসিনের

বোতল সংগ্রহ করিয়া আবার ছাদে উঠিয়া আসিল। বুক তার বড় বেশী জোরে স্পন্দিত হইতেছে, পাদুটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, মাথার ভিতর ঝিম ঝিম করিতেছে, এ কি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবি কি তার চোখের সম্মুখে ঘুরিতে সুরু হইল? প্রবল ভূকম্পনে বাড়ী ঘর সবই কি দুলিয়া উঠিয়াছে? না, না এ তার নিজেরই দৃষ্টির ভ্রম। কার পায়ের শব্দ শোনা যায়, যমদূত কেহ তাহাকে লইতে আসিল বুঝি,—তাও না। পাশের বাড়ীর হুলো বিড়ালটা এ ছাদে লাফাইয়া পড়িয়াছে, ঢঙ ঢঙ করিয়া ঘড়ীতে কয়টা বাজিল? দুইটা,—আর বিলম্ব করা না, যখন যাইতে হইবে তখন আর কেন, বালিকা আর একবার জন্মশোধ আকাশের দিকে তাকাইল, তার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সমস্ত কেরোসিন তৈল আপনার মাথা ও গায়ের কাপড়ে ঢালিয়া ফেলিল।

তার পর? তার পর আর কি, মুহূর্ত্তে লেলিহান অগ্নি শিখা তার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া তার তরুণ

তনুখানি জড়াইয়া ধরিল, স্তব্ধ রাত্রে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না, আকাশে সহস্র তারা আপনার দৃষ্টি মেলিয়া বঙ্গভূমির রঙ্গালয়ের এ আহুতি দৃশ্য দেখিয়া বুঝি সরম সঙ্কোচে কাঁপিয়া উঠিল।

ঠিক্ সেই সময় বঙ্গযুবক সুধাকান্ত অর্দ্ধরাত্রে বায়স্কোপে "my heart is best" নামক নাটকের দৃশ্য দেখিয়া আসিয়া নিদ্রাহীন চক্ষে শয্যার উপর বসিয়া বাঁধান খাতা লইয়া 'প্রিয়ার উদ্দেশ্যে' শীর্ষক একটি বিরহ কবিতা রচনা করিতে সুরু করিয়াছিল।



আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক-পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত

হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৫০ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ৬/০ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "**গ্রাহক-নম্বর**" সহ পত্র দিতে হইবে।

১। **অভাগী** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। **পল্লীসমাজ** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৫। **বিবাহবিপ্লব**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।
৬। **চিত্রালি**—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। **দূর্ব্বাদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।
৮। **শাশ্বতভিখারী** (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
৯। **বড়বাড়ী** (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। **অরক্ষণীয়া** (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। **ময়ূখ** (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।
১২। **সত্য ও মিথ্যা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। **রূপের বালাই** (২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। **সোণার পদ্ম** (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। **নাইকা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। **আলেয়া** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। **বেগম সমরু** (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। **নকল পাঞ্জাবী** (৩য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯। **বিল্বদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। **হাল্‌দার বাড়ী** (২য় সং)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। **মধুপর্ক**—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। **লীলার স্বপ্ন**—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। **সুখের ঘর** (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।
২৪। **মধুমল্লী** (২য় সং)—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। **রসির ডায়েরী**—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। **ফুলের তোড়া** (২য় সং)—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। **ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। **সীমন্তিনী**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। **নব্য-বিজ্ঞান**—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ।
৩০। **নববর্ষের স্বপ্ন**—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। **নীলমাণিক**—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ।
৩২। **হিসাব নিকাশ**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্‌।
৩৩। **মায়ের প্রসাদ**—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। **ইংরেজী কাব্যকথা**—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ।
৩৫। **জলছবি**—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। **শয়তানের দান**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। **ব্রাহ্মণ-পরিবার**—(২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৩৮। **পথে-বিপথে**—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।
৩৯। **হরিশ ভাণ্ডারী** (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
৪০। **কোন্‌ পথে**—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।

৪১। **পরিণাম**—শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ।
৪২। **পল্লীরাণী**—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪৩। **ভবানী**—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৪৪। **অমিয় উৎস**—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। **অপরিচিতা** (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।
৪৬। **প্রত্যাবর্ত্তন**—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৪৭। **দ্বিতীয় পক্ষ**—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল।
৪৮। **ছবি** (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। **মনোরমা**—শ্রীসরসীবালা বসু।
৫০। **সুরেশের শিক্ষা**—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ।
৫১। **নাচ্‌ওয়ালী**—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ।
৫২। **প্রেমের কথা**—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।
৫৩। **গৃহহারা**—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৪। **দেওয়ানজী**—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৫৫। **গৃহদেবী**—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।
৫৭। **হৈমবতী**—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।
৫৮। **বোঝা-পড়া**—শ্রীনরেন্দ্র দেব।
৫৯। **বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
৬০। **হারান ধন**—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।
৬১। **গৃহ-কল্যাণী**—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।
৬২। **সুরের হাওয়া**—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস্‌-সি।
৬৩। **প্রতিভা**—বরদাকান্ত সেনগুপ্ত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার বিচার-ভার পাঠক-পাঠিকাগণের উপর।

শশিনাথ একটি অদ্ভুত প্রকৃতির যুবক। সেই জন্য তাহারই উপর এই বিরাট, জটিল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমাজ সমস্যার সমাধানের ভার পড়িয়াছে। উর্ম্মিলা, সোমনাথ, লীলা, সরযু, বরেন, সুধীর—এই সব মিত্র ও শত্রুগণের সহায়তায় এবং বিঘ্ন বাধায় শশিনাথ সমাজ সংস্কার কার্য্যে কতটা অগ্রসর হইয়াছে, কি কতটা পিছাইয়া গিয়াছে—তাহা বইখানি আগাগোড়া না পড়িলে বুঝিতে পারিবেন না।

প্রেমের চিত্রাঙ্কণে গ্রন্থকারের তুলিকা রাফেলকেও পরাজিত করিতে সমর্থ। লীলা-সরযূর ফোটে-ফোটে তবু ফোটে না প্রেম—উর্ম্মিলার সুস্পষ্ট ও সুব্যক্ত পতিপ্রেম,—বরেনের একনিষ্ঠ সংযত প্রেম;—শশিনাথের গঙ্গোর্ম্মিতুল্য উদ্দাম, অবাধ, হারাইয়া যাওয়া হঠাৎ ফিরিয়া পাওয়া অস্থিরগতি প্রেম—সুধীরের ঝড়ের বেগে আগন্তুক ও শরের বেগে পলাতক প্রেম—প্রকাশের 'বদ্‌লে গেল মতটা' গোছের কপট প্রেম—প্রেমের বিবিধ ও বিচিত্র রঙ্গ ও লীলা এই একখানি গ্রন্থে সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা এমন মধুর, বর্ণনার ভঙ্গী এমন সুন্দর, কোন একটি প্রসঙ্গের অবতারণায় লেখনী এমন চতুর, বইখানির প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে তাহার পরিচয় সুপ্রচুর। বর্ণে বর্ণে লাইনে লাইনে তৃপ্তি, আনন্দ, প্রসাদে ভরপুর।

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত মতামত :—

'হিন্দুস্থান' বলেন ;—'ঘরের ডাক' যখন মাসিক ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে বাহির হয় তখনই আমরা * * নবীন লেখকের শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম। এখন * * * আদ্যন্ত পড়িয়া আশান্বিত হইয়াছি। * * * বিশ্বপতি বাবু আমাদের সমাজের একটা প্রকাণ্ড অভাব এবং অভিযোগের দিক তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ সংযত এবং কবিত্বময় আবরণ ও ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া গুটিকতক চরিত্র বিশ্লেষণের অবসরে অত্যন্ত নিপুণ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। * * * বইখানি আগাগোড়া একটা কৌতুহল ও প্রসাদগুণ বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। এরূপ জটিল সমস্যামূলক উপন্যাসকে সুখপাঠ্য করিয়া তুলিতে হইলে যথেষ্ট শক্তির দরকার —সে শক্তি বিশ্বপতি বাবু যথেষ্ট দেখাইয়াছেন। * * * বইখানি মোটের উপর আমাদের ভালই লাগিয়াছে।—১৬ই বৈশাখ ১৩২৯

আনন্দবাজার পত্রিকা ;—* * * চরিত্র নির্ব্বাচনে গ্রন্থকার গতানুগতিক পন্থানুসরণ করেন নাই। সবগুলি চরিত্রই সংযত, শুভ্র, সুন্দর।—ফেনিল উচ্ছ্বাস নাই, অনর্থক বাজে বকুনি নাই, * * * যাহা আছে, তাহা স্বাভাবিক, রক্তমাংসের মানুষের সুখ দুঃখের পরিচিত অনুভূতি। বিশ্বপতি বাবুর স্বভাবসিদ্ধ ভাষার অনাড়ম্বর ঋজুগতি কোন স্থানে আড়ষ্ট হয় নাই ; * * * বইখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। (৪ঠা বৈশাখ, ১৩২৯)—

গৌরী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—১৲

অভিনব নূতন গার্হস্থ্য উপন্যাস।

প্রিয়জনকে উপহার দিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ—বৌদিদির মাতৃহীন শিশু দেবরকে মাতৃস্নেহে পালন—দেবরের মাতৃ-স্বরূপা ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি শৈশবের প্রীতিকর-আব্দার-উপদ্রব,—যৌবনে মায়ের ন্যায় প্রগাঢ় ভক্তি—অকৃত্রিম ভ্রাতৃভক্তি—প্রশংসনীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতির সুন্দর চিত্র সকল চিত্রিত আছে।—

নায়ক বলিয়াছেন;—বই খানি পড়িয়া বড় মিষ্ট লাগিল। * * * স্বর্ণলতা পড়িয়া যেমন তৃপ্তি পাইয়াছিলাম, গৌরী পড়িয়া * * * তেমনিই তৃপ্তি পাইয়াছি। * * * চিত্রটি গ্রন্থকার সুন্দর ভাবে ফুটাইয়াছেন। * * * এই গৌরী ও শিশির আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ হইলে বাঙ্গালা যথার্থ সোণার বাঙ্গালা নাম সার্থক করিবে।—১৪ই বৈশাখ ১৩১৯

নমিতা

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত—২৲

ইহাতে মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ আছে, তাহা অতি সুন্দর। কর্ত্তব্য-পরায়ণতা যে কেমন করিয়া জয়যুক্ত হয়, পরের অনিষ্ট করিতে গেলে যে, কেমন করিয়া নিজেরই অনিষ্ট হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। **'নমিতা'র** চরিত্রে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখিকা মহোদয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছে।

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত—১।০

বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের অপরূপ রত্ন।—বাঙ্গালার সেই অদ্বিতীয় অমর গদ্য-কাব্য—সমস্ত মানবের মনোমুগ্ধকর। শ্মশান-বর্ণনার একটু নমুনা দেখুন ঃ—"এইখানে আসিলে সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত, মহৎ, ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইংরেজ, বাঙ্গালী এইখানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈষা বল, মুসা বল, রামমোহন রায় বল, এমন সাম্য-সংস্থাপক জগতে আর নাই। বাজারে সবএকদর—অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র।"

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—১৲

—বাঙ্গালী সৈনিকের জীবনচরিত। আমাদের শাসন-কর্ত্তাদের অনুগ্রহে ভীরু বাঙ্গালীও সৈনিক হইল। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্বে এই ভীরু বঙ্গবাসীরই একজন নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তি বিদেশে আপন অসাধারণ ক্ষমতাগুণে সৈনিক-জীবনে গণ্যমান্য হইয়াছিলেন।—যাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্বে ও কার্য্যে টাইম্‌স বলিয়াছেন,—"যে দেশে সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, জগদীশ বসু ও অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মিতে পারে সে জাতিকে অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না।" সেই বঙ্গ-গৌরব সুরেশচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী।